# সুরেশ বিশ্বাস

উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।



Binding

ষষ্ঠ সংস্করণ



প্রিণ্টার- শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# ভূমিকা

বীর, কবি বা সাধু-সদাশয়গণ সর্ব্বদেশে সমাদৃত। তাঁহারা চলিয়া যান, সংসার তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী বুকে করিয়া রাখে; বুকে করিয়া আপনি ধন্য হয়! কেন না, মাটীর পৃথিবীতে অমর সন্তানের জন্ম, মহা-গৌরবের কথা, সুধু গৌরবের কথা নহে,—পরম প্রয়োজনীয়; পৃথিবীর শান্তিতৃপ্তি উন্নতি-উৎসাহের অনন্ত-উৎস। এই অভাবকঠিন মলিন মর্ত্ত্যের অনন্ত-পথের অনন্ত যাত্রিসম্প্রদায় যখনই পৃথিবীর দিগন্তপ্রসারী ধূলিরাশির মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়, তখনই ইতিহাস বা জীবন-চরিত সেই ধূলিজঞ্জাল সরাইয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলে, ইঁহারা কেমন শাক্তিসরিতে পৃথিবীর ধূলিরাশি সরাইয়াছেন,—ইঁহারা কেমন ধূলিরাশি সরাইয়া অচল অটল মহিমা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইঁহারাও পৃথিবীতে দুইদিনের জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাস-জীবনচরিতে তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য স্থায়ী করিয়াছেন। তেমন চিরসঙ্গী পাইলে, এমন দুর্ভাগ্য কে আছে যে, আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করে?

এখন একটি কথা, এমন সৌভাগ্যবান কয় জন—যাঁহারা অনন্তকাল অসংখ্য অশান্ত লোকের হৃদয়ে শান্তিদান করিতে পারেন—যাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী অবসন্ন-প্রাণে উৎসাহের অনলশিখা জ্বালাইয়া দেয়! এই হতভাগ্য দেশে বর্ত্তমানকালে সেরূপ জীবনী অধিক নাই বটে, কিন্তু বিরল বলিয়াই দুই-একটি যাহা দেখিতে পাই, তাহাই সমধিক আদরের ধন! দরিদ্রের সম্বল বহুমূল্য না হইলেও সাতিশয় প্রিয়।

একজন কপর্দ্দক-শূন্য নিতান্ত নিঃসম্বল বঙ্গবাসী, যাঁহার দ্বিতীয় বস্ত্রমাত্র ছিল না—বিদেশে অপরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতাগুণে কিরূপে সৈনিক-জীবনে গণ্যমান্য যাঁহার অপূর্ব্ব-বীরত্বে ব্রেজিলবাসী মুগ্ধ—শৌর্য্যবীর্য্যে যিনি বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়,—যাঁহার কার্য্যে মেকলে প্রমুখ বাঙা বাঙালীর ভীরুতাপবাদ অমূলক কাহিনীর মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ন্যায় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্রও যাঁহার উল্লেখ করিয়া বলি যে দেশে একই সময়ে সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, জগদীশচন্দ্র বসু চট্টোপাধ্যায় জন্মিতে পারে, সে জাতিকে অবজ্ঞা করা যা না—সেই বঙ্গগৌরব সুরেশচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী বঙ্গবাসী সমাদরের সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই।

---

## দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সুরেশচন্দ্রের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার শেষ পত্রাদি যতদূর সংগৃহীত হইয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইল।

এই পুস্তকের "ক্যাপিরাইট-স্বত্ব" শ্রীযুক্ত ব্রজহরি দত্ত আ করিয়াছে; সুতরাং এই সংস্করণ হইতে তাঁহার আর কোন না, সমুদয় স্বত্বই আমার রহিল।

শ্রীগুরুদাস চট্টো
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রী



কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

# সূচীপত্র

## সূচীপত্র

# সূচীপত্র

# অবতরণিকা

## বঙ্গ ও বঙ্গবাসী

অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি পৃথিবীর অক্ষয় শস্যভাণ্ডার; বঙ্গভূমি তাঁহার পরম আদরের পরমা সুন্দরী তনয়া। পুণ্যবতী মাতার আদরিণী কন্যা শোভাময়ী, শান্তিময়ী, স্নেহময়ী, অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী। বঙ্গের সৌন্দর্য্য-গৌরব ভীষণতায় নহে; এখানে প্রকৃতিদেবীর সহাস্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধমাধুরী-মহিমা—অপরূপ রূপমাধুরী। সমুন্নত পর্ব্বতশিরে সুশোভন বৃক্ষরাজী বঙ্গের শোভা-সম্পত্তি নহে; পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া স্রোতস্বতী এখানে উদ্দামগতিতে প্রবাহিতা নহে, ঘনপত্রপল্লবাচ্ছাদিত ভীষণ অধিত্যকা-প্রদেশও এখানে নাই; কিন্তু শস্যশ্যামলা সদা হাস্যময়ী সমতলভূমি—উদার, পবিত্র, মোহন, সরল সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। পাষাণভাঙ্গা প্রবল প্রবাহিণী বঙ্গভূমিতে আসিয়া ধীর মন্থর গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বক্রগতিতে ক্রীড়া করিতেছে। বক্ষে অগণ্য সুখশান্তিপূর্ণ নগরী। নগরী অসংখ্য সরল, সহাস্য, শান্তিপ্রাণ নরনারীপূর্ণ; গৃহে গৃহে তাহাদের আনন্দ উৎসব—প্রতি উৎসবে প্রেমভক্তি শত ধারায় উৎসারিত। সে প্রেমতরঙ্গমালা অশান্ত নহে অথচ বিপুল—বিশাল—বেগবতী—সঞ্জীবনী। সমগ্র মানব-বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ। জগতে তাহার তুলনা নাই; স্নেহ-শান্তিমালা সহস্রমুখিনী হইয়া অজস্র ধারায়

সেই বিশাল প্রেমসমুদ্রে মিশিয়াছে। গভীরতায় উহা অসীম, বিচিত্রতায় অনন্ত, আস্বাদনে অনন্ত আবেশ—আবেশে পরমতৃপ্তি। এই দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ মলিন মর্ত্ত্যধামের সকল জঞ্জাল তাহাতে ভাসিয়া যায়।

এই বিচিত্র মোহিনী মাধুরীর লীলাস্থলীতে স্থানে স্থানে যে, ভীষণ সৌন্দর্য্যের অঙ্কপাত নাই, তাহা নহে;—থাকিলেও সৌন্দর্য্যসাগরে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। পতিতপাবনী গঙ্গাধারায়, ব্রহ্মপুত্রের পুণ্যপ্রবাহে এবং অসংখ্য উপনদী ও শাখানদীর সংস্পর্শে বঙ্গ সদাই সরস-শ্যামলা। অতীতকালের কত কীর্ত্তিকাহিনী সেই পবিত্র ধারার অণু-পরমাণুতে মিশাইয়া রহিয়াছে। আর পুণ্যপ্রবাহিনী ভাগীরথীর সেই তারিণী জননীমূর্ত্তি—অপরে কে তাহার স্বরূপ বুঝে! অন্যে জননীকে সামান্যা স্ত্রীজাতি মাত্রই দেখে, কিন্তু সন্তান কতক বুঝে, জননী কি স্নেহ-শীতলা সর্ব্বাপদ্নাশিনী সর্ব্বভয়বারিণী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গভূমি অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে বিরাজিতা; খনিজ সম্পদে তিনি দরিদ্রা নহেন। ষড়্ঋতু পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ উপহার লইয়া বঙ্গদেবীর পূজা করিয়া থাকে। এই ধনজনপূর্ণ বিশাল বিচিত্র প্রদেশের জল-বায়ুও বিচিত্র; কিন্তু সাধারণতঃ সরস বা সদার্দ্র। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়াই যে এরূপ, তাহা নহে; প্রকৃতির দুর্ভেদ্য নিয়মবশে বিশাল সমুদ্রগর্ভ হইতে এই প্রদেশ উত্থিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে ইহার উর্ব্বরতা ও আর্দ্রতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানবিদ্ বলেন, অতি পূর্ব্বে অতীতের দুর্ভেদ্য তমসাচ্ছাদিত গহ্বরে, অনন্তকালের বিরাট জঠর অন্বেষণ করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রে যে স্থান বঙ্গচিত্রে সুশোভিত, এক সময় সেই সুখভূমি, প্রকৃতির বিশাল জলময়ী মূর্ত্তির কুক্ষিগর্ভে ছিল। অনন্তসাক্ষী হিমালয়ের তটভূমিতে তাহার তরঙ্গাভিঘাত হইত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন আর্য্য জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা তখন মধ্য-আসিয়ার

বিস্তৃত অধিত্যকায় সুখে পশুচারণ করিত, আর অগ্নি প্রভৃতি বিশ্বশাসিনী বিভিন্ন শক্তিকে সরল বিশ্বাসে উন্মুক্ত প্রাণে উপাসনা করিয়া সঙ্গীততরঙ্গে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিত। হিমালয়ের অত্যুচ্চ পাষাণ-গাত্রে আজিও শঙ্খ ও বিবিধ সামুদ্রজীবের কঙ্কালচিহ্ন রহিয়াছে। তাহাতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ হয়, এক সময়ে তথায় বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গাভিঘাত হইত। এক সময়ে তথায় বজ্রসার কঠোর প্রকৃতির সহিত তরঙ্গরঙ্গময়ী বিশাল জলময়ী প্রকৃতির নিত্য সংঘর্ষ হইত। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে। কালচক্রে নিয়তির আবর্ত্তনে বিশাল সাগরগর্ভ হইতে এই রূপরসগন্ধস্পর্শময়ী অগণ্য মানবের আবাসভূমি বঙ্গ গঠিত, সজ্জিত ও শোভিত হইয়াছে। সেই অবিরত সংঘর্ষফলে বা প্রাকৃতিক নিয়মবশে কেমন করিয়া সলিল হইতে প্রদেশ জন্মিল, বিজ্ঞানে সেই জটিল রহস্য—প্রকৃতির লীলা বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম।

বঙ্গভূমি অগণ্য মানবের বাসস্থান হইয়া অবধি ইহার জল-বায়ু আপনার দুর্ব্বলকর প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রাচীন আর্য্যগণ যখন তাঁহাদের বিজয়িনী গতিতে উত্তর-ভারত অতিক্রম করিয়া এই পরম রমণীয় প্রদেশের প্রান্তে পদার্পণ করিলেন, ঐতিহাসিক বলেন, তখন উহা অসংখ্য কৃষ্ণকায় জাতির বাসস্থান ছিল। তাহারা সভ্যতা-সম্পর্কমাত্রশূন্য; আকৃতিগত পার্থক্য ব্যতীত শিক্ষা-সংস্কারে তাহারা পশু কি মানব, বুঝিবার বিশেষ উপায় ছিল না। জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের, আর্য্যদিগের সহিত এই কৃষ্ণকায় বর্ব্বরদিগের সংঘর্ষে সেই আদিম অধিবাসীরা পরাভূত হইলে উহাদের কতকগুলি সেই নবাগত আর্য্যজাতির বশ্যতা স্বীকার করিল। কিয়দংশ বা আপনাদের বন্য-জীবনের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য

প্রদেশের বনজঙ্গলে আশ্রয় লইল। ইতিহাসে অবগত হওয়া যায়, এই আদিম অধিবাসীর মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা এই বিজয়ী আর্য্যজাতির দাস বা সেবকরূপে আত্মসর্পণ করিল। এইরূপে আর্য্যজাতির সহিত তাহাদের দাস্য নিয়ন্ত্রিত হইল। যাহা হউক, এ স্থলে এই সকল প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় আমাদের বিশেষ আবশ্যক নাই।

আর্য্যগণ এই প্রদেশে আসিয়া দেখিলেন, ভূমি উর্ব্বরা, জলবায়ু মৃদু ও সরস। ক্রমে স্থানীয় প্রকৃতি এই বিজয়ী আর্য্যবীরদিগের উপর আপনার দুর্জ্জয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহারা অল্পায়াসে প্রচুর শস্য উৎপাদিত করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির মাধুরীতে তাঁহাদিগের অন্তর কোমল ও মৃদু করিয়া তুলিল; তাঁহারা ক্রমশঃ অবিরত কার্য্যোদ্যোগের মহামহিমা অল্পাধিক বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। ক্রমে আলস্যের বশীভূত হইলেন। তখন সেই দীর্ঘ নিশ্চিন্ত অবসরে কার্য্যপ্রবণ শান্তিময় জীবনে চিরশান্তির কথা—ধর্ম্মোন্দোলনের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। সেই ধর্ম্মতত্ত্বালোচনার ফলে একে একে শরীরের বল ও সমর-রঙ্গের আনন্দ-নৃত্য অন্তর্হিত হইয়া আসিতে লাগিল। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও মনে হয়, অনায়াসে বা অল্পায়াসে প্রচুর শস্য-সম্পদ্‌লাভই জাতীয় বলবীর্য্য অবসানের প্রধান বা একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে গ্রীস ও ইটালীর নিকট এককালে প্রায় সমগ্র পৃথিবীবাসী কেন মস্তক অবনত করিয়াছিল! উর্ব্বরতায় গ্রীস ও ইটালী অতুল্য। আজ না জানি, কোন্ দুর্ভেদ্য নিয়তিবেশে সেই প্রচণ্ড দুর্জ্জয় জাতির বীরদর্পের অবসান হইয়াছে; কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যখন যূনানী ও রোমকগণ জগতীতলে বীরগৌরবে যশঃসৌরভে পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছিল, তখন কি তথাকার ভূমি উর্ব্বরা ছিল না? এখনও স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র বিজ্ঞানের বিহারভূমি ইউনাই-

ষ্টেডষ্টেট্সের স্থানে স্থানে ভূমি যেরূপ উর্ব্বরা অথচ সেই সেই প্রদেশ যেরূপ কর্ম্মপ্রাণ বীরজাতির বাসভূমি, তাহাতে কেমন করিয়া বলিব, উর্ব্বরতাই বীরগর্ব্ব অবসানের প্রধান কারণ! অন্নপূর্ণার সন্তান হইলেই কি অসুরনাশিনী শ্যামামূর্ত্তি বিস্মৃত হইতে হইবে!

দ্বিতীয় কথা, বায়ুর আর্দ্রতা—ভূমি সজলা, সমুদ্রগর্ভ হইতে অনুচ্চ বলিয়াই যদি এতৎপ্রদেশবাসীর বীর্য্যহীনতা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে উচ্চ স্থানের অধিবাসীরাই পৃথিবীর প্রধান জাতি হইত, এবং ইংলণ্ডের ন্যায় সজল-বায়ুসেবিত দেশবাসিগণের বিশাল সাম্রাজ্য সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন না, শুনিতে পাইতাম না। নিয়তির দুর্ভেদ্য রহস্য, প্রকৃতির বিচিত্র লীলাপট উত্তোলন করিয়া জাতীয় অধঃপতনের বিশাল মর্ম্মান্তিক ইতিহাস এ স্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে প্রধানতঃ এই মাত্র বলিতেছি—স্থানীয় প্রকৃতিক্রমে অদৃষ্ট-চক্রে নিয়তিবশে একটি বিজয়ী বীরজাতির চিত্তবৃত্তি বঙ্গে আসিয়া বিভিন্ন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা যে স্থানীয় প্রকৃতির বিশ্ববিজয়ী বিজয়নিশান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্গের বিস্তৃত বিশ্বস্ত পুরাবৃত্ত নাই, সুতরাং প্রাচীনকালের বীরত্ব-গৌরবও নাই। যাহা আছে, তাহা মেকলে-প্রমুখ লিপিকুশল ঐতি-হাসিকের অমূলক কল্পনা এবং ভারত আকাশের প্রচণ্ড ধূমকেতু মুসল-মান ঐতিহাসিকদিগের রচনা। তবে প্রকৃত ইতিহাস কোথায় পাইব? বহুকাল পরপদদলিত ইতিবৃত্তহীন জাতির ইতিবৃত্ত কোথায়? এতকাল পরাধীন, অত্যাচারিত ও পরপদদলিত হইয়াও যাহারা সরল পবিত্র প্রফুল্ল হৃদয় লইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস কিরূপ! কোন্ অপূর্ব্ব জীবনীশক্তিতে তাহারা প্রাচীন হইয়াও নবীনহৃদয়—শত বিঘ্ন-বিপৎপাতেও সদাই উৎফুল্ল—গৃহে গৃহে আনন্দকোলাহল—হৃদয়ের কোমলতা কিছুতেই ঘুচে না; গৌরব-ভ্রষ্ট হইয়াও গৌরবহীন নহে!

সেই বীরদর্প মৃতুতায় পরিণত হইয়াছে বটে, তাহা বলিয়া বঙ্গভূমি অধুনাও বীরশূন্যা নহে। ইংরাজ ঐতিহাসিক মেকলের তীব্রোক্তি "বাঙ্গালী দাসের জাতি; শঠতা, মিথ্যাবাদিতা, ভীরুতা প্রভৃতি যত কিছু নীচতা থাকিতে পারে, বাঙ্গালী জীবন কেবল তাহাতেই গঠিত। আজ বলিয়া নহে, চিরকাল।" একটি জাতীয় চরিত্রে অতগুলি কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া তিনি আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বহ ভার লাঘব করিলেন বলিয়া তাহা ইতিহাস নামে পরিচিত হইতে পারে না। উহা সদাশয় ইংরাজজাতির উপযুক্ত নহে অথবা ঘাতকের নিকট সুষমাময়ী রমণী বা সহাস্য সুন্দর বালকের সৌন্দর্য্য দেখিবার অবসর কোথায়!

আর এক জাতীয় কলঙ্ক—অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের বিনাযুদ্ধে পলায়ন। সপ্তদশসংখ্যক যবন অশ্বারোহী আসিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিল—আর বঙ্গেশ্বর অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় স্থিরনিশ্চয় করিয়া অন্তঃপুরের গুপ্তপথ দিয়া পলায়ন করিলেন। শত্রুদিগকে বাধা দিবার কেহ রহিল না, কেহ বাধা দিল না। এইরূপে বঙ্গের স্বর্ণসিংহাসন বিজাতীয় ম্লেচ্ছের করতলগত হইল। বঙ্গ সৌভাগ্যরবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী দ্বারা একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য অধিকৃত হইল, এই অপূর্ব্ব উপন্যাসে কল্পনার নবীন লীলা থাকিতে পারে, কিন্তু মনস্বী ব্যক্তি তাহা ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। বিশেষতঃ সেই হিন্দু-স্বাধীনতার সময় যবনজাতির প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল, তাহাতে রাজা পলায়ন করিলেই রাজ্যবাসী পর্য্যন্ত বাধা মাত্র না দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইবে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। হইতে পারে, ভীমার্জ্জুনশ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ছদ্মবেশে বা কোন মোহনমন্ত্রবশে জরাসন্ধপুরী প্রবেশের ন্যায় সেই সপ্তদশসংখ্যক অশ্বারোহীও রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল! হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় কোন পরমযোগী বিশ্বহিতৈষী বৃথা রক্তপাত-নিবৃত্তির জন্য পলায়নের পরামর্শ

দিয়াছিলেন! ছলনায় হউক, আর প্রকৃত ভক্তিপাত্র বলিয়া অচল ভক্তিবশেই হউক, রাজা পলায়ন করিলেন। হইতে পারে, সমস্ত বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া যবন যখন রাজপুরী-প্রবেশ করিয়াছে, রাজ্যরক্ষা ও আত্মরক্ষার আর উপায় নাই, তখন পলায়ন কি জগতের ইতিহাসে একটি অসাধারণ দুরপনেয় কলঙ্ককাহিনী! বিশেষতঃ, বিশ্বাসঘাতকতার বলে, সপ্তদশজন মাত্র অশ্বারোহী যদি অবাধে পুরী-প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাকে সপ্তদশ অশ্বারোহীতে দেশজয় বলে না। নিদ্রিত বা অন্ধ, হস্তপদবদ্ধ মহাবীরের গলদেশে ফাঁসী লাগাইবার জন্য সপ্তদশ কেন, একজন অশ্বারোহী হইলেই যথেষ্ট।

এই স্থলে আবার সেই কথা। যখন বিশ্বাসঘাতকতায় বঙ্গগৌরব নষ্ট হইয়াছে, তখন বাঙ্গালীজাতি যে বিশ্বাসঘাতক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যুক্তি অপূর্ব্ব, হৃদয়গ্রাহিণীও বটে! বিশ্বাসঘাতকতায় বঙ্গ বিজিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া বিশ্বাসঘাতকতা ইহাদিগের চরিত্র নহে। বিশাল পৃথিবীতে এমন কোন্ স্বর্গভূমি আছে, যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা নাই;—যে দেশের ইতিহাসের অধ্যায় এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিত নহে? তাহা বলিয়া কোন্ মূর্খ বলিবে, সেই জাতি বিশ্বাসঘাতক! মানবজাতিমধ্যে সর্ব্বত্র সদসৎ ব্যক্তি আছে, বৈচিত্র্যের জন্য বুঝি চিরকালই থাকিবে।

স্বীকার করিলাম, কেবল সপ্তদশসংখ্যক যবন-বীরদ্বারা বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছে; কিন্তু আফগানদিগকে তাহার অর্দ্ধভাগ মাত্র জয় করিতে এক শতাব্দীরও অধিক অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। কত সহস্র বীর অজস্রধারে শোণিত বিসর্জ্জন করিয়া আংশিক বিজয়-লাভে অধিকারী হয়। মুসলমানদিগের পূর্ণ সৌভাগ্যের সময় বঙ্গের স্থানে স্থানে স্বাধীন নরপতি ছিলেন, তাঁহাদের সৈন্য সমস্তই বাঙ্গালী। এখন একটি সন্দেহ, হয় ত তাঁহারা বড় বড় জমিদার ছিলেন। পশ্চিম-

ভারত হইতে সিপাহী আনিয়া রাজ্য করিতেন। কিন্তু সে কথা নিতান্ত অমূলক, কারণ, তখন পশ্চিম হইতে সিপাহী আমদানী হইত না—বঙ্গের পাইক বিখ্যাত ছিল। পলাশীর যুদ্ধেও তাহারা অসাধারণ বীরবিক্রম প্রদর্শন করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গের বীরত্ব-পরিচয়ে আর কাজ কি? একটি দ্বারবান্ রাখিতে হইলে, তাহাও পশ্চিম হইতে আনাইতে হয়! ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, এখন এতদঞ্চলে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বারবান্ রাখা ফরাসীদেশের সুইস্ দ্বারবান্ রাখার ন্যায় একটা রীতি দাঁড়াইয়াছে।

এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলমান রাজত্বে অধিকাংশ বঙ্গবাসী যখন কোন না কোন শান্তিময় উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিত, তখনও কিয়দংশ বাঙ্গালী ব্যায়ামাদি বিবিধ সামরিক ক্রীড়া-কৌশলে সময়াতিপাত করিত। সময়ে সময়ে সেই সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এমন এক একজন অসাধারণ সামরিক পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রকৃত বীরত্ব-গৌরবে বরণীয়। মোগলদিগের পূর্ণপ্রতাপের সময়েও বঙ্গে যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য ছিলেন। যে সকল অমর বীরগাথা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তিনি যে একাকীই সেই প্রভূত যশের একমাত্র অধিকারী, তাহা নহে। শঙ্কর প্রভৃতি প্রতাপের অনুচর পার্শ্বচর সহকারীরাও যে এক একজন অসাধারণ সমরকুশল বীরপদবাচ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনেকেই এক একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতাপ! নেপোলিয়নের ন্যায় রণবীর পৃথিবীর মধ্যে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহকারীমধ্যেও অনেক ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন ছিল। বর্ত্তমানের দিকে অগ্রসর হইলেও আরও শত সহস্র উদাহরণ পাওয়া যাইবে, বাঙ্গালায় সাহসিকতা বা বীরবিক্রম অন্তর্হিত হয় নাই। তবে সুবিধা থাকিলে, শক্তির পরিচালনা থাকিলে, তাহা সমধিক বিকাশ হইতে পারিত।

যাহা হউক, এই সম্বন্ধে এ স্থলে অধিক বিস্তারের আবশ্যকতা নাই। বঙ্গগরিমা-প্রচারও ইহার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, গর্ব্ব ও গৌরব দুইটি স্বতন্ত্র! আত্মগর্ব্ব দূষিত হইলেও আত্মগৌরব সমাদরের সামগ্রী।

বিদেশীয় বিবেচক ব্যক্তিগণ যে বাঙ্গালীকে একেবারেই বুঝেন না, তাহা নহে। মহতের অন্তর কবে মহত্ত্ব-ধারণায় অক্ষম? বিদ্বান্ ও মূর্থ, ধীর ও হঠকারী, সাধু ও অসাধু সকল জাতির মধ্যেই আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ষ্টীভেন্স নামে কোন সাহেব অযাচিত কৃপাবশে বাঙ্গালীর চরিত্র-সমালোচনায় আপনার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপাঠে নিশ্চিন্ত নির্ব্বাক্ না থাকিতে পারিয়া তদুত্তরে মান্যবর ওল্ডহাম্ সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, আমরা তাহার মর্ম্মার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া এই অপ্রীতিকর সমস্যার উপসংহার করিব।

ষ্টাভেন্স্ সাহেব বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে যে সকল কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, শূরোচিত কোন কার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষমতাই তন্মধ্যে প্রধান। কিরূপ শৌর্য্যবীর্য্যের কথা ষ্টীভেন্স্ সাহেবের লক্ষ্য, তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। কিন্তু এ স্থলে তাঁহার সহিত শ্লীমান্ সাহেবের মত একবার তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আমি সময়াভাবে সেই পুস্তক হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; কিন্তু শ্লীমান্ বোধ হয় এই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে, বীরত্ব শব্দে যদি স্ত্রীজাতির প্রতি সমুচিত সম্মান-প্রদর্শন এবং তাহাদিগের রক্ষার জন্য কষ্ট ও ত্যাগ-স্বীকার, এমন কি, প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন বুঝায়, তাহা হইলে ভারতবাসিগণের য়ুরোপীয়-দিগের নিকট বড় কিছু শিখিবার নাই। শ্লীমান সাহেব বঙ্গদেশে যতকাল ছিলেন, ষ্টীভেন্স্ সাহেব তাহার তুলনায় অত্যল্পকাল মাত্র অবস্থিতি করেন। কর্ণেল শ্লীমান্ মধ্যভারতে অবস্থানকালে প্রোক্ত বিষয় লিখিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী বা মধ্যভারতবাসী সম্বন্ধে তিনি যাহা

যাহা লিখিয়াছেন, উভয়ই জ্বলন্ত সত্য। সকল দেশের অধিবাসী-দিগের বিপক্ষে সহজেই শঠ বা অবিশ্বাসী বলিয়া অভিযোগ আনা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতার অপবাদ, আমার বোধ হয়, মেকলের অলীক উপন্যাসের উপর স্থাপিত। যখন বিভিন্ন সময়ে সঙ্কটময় সকল স্থানেই বঙ্গবাসীর সাহসিকতায় আমাদের অনেকের জীবনরক্ষা হইয়াছে, তখন আর সেই অসত্য অভিযোগ শোভা পায় নাই।

"ডিকেন্স্ সাহেব-বর্ণিত কতিপয় নাগরিক কেরাণী-জীবনের ইতিহাস সমগ্র ইংরাজজাতির মনুষ্যত্বের ইতিহাস বলিলে যেরূপ শুনায় এবং তাহা যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য, মেকলে সাহেব-বর্ণিত বাঙ্গালীচরিত্রের ইতিহাসও তদ্রূপ! মেকলে সাহেব তাঁহার লেখার উপকরণ, কতকগুলি কেরাণী ও নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সামরিক বিভাগে প্রবেশে অনিচ্ছাই বোধ হয়, তাঁহার এই ধারণার মূল। বাঙ্গালীর শীর্ণ অবয়ব যে তাহার সাহসের অন্তরায়, তাহার কোন আভাস আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আনিতে পারি না। বাঙ্গালীর শীর্ণকায় বরং ম্যালেরিয়ার দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপেরই পরিচায়ক—সাহস অভাবের কারণ নহে। বাঙ্গালীর ইউনিফরম পরিবার ও সামরিক শৃঙ্খলার ভিতর বাঁধা থাকিবার অনিচ্ছাই মেকলের মতের মূল। সর্ব্ববিষয়ে প্রশ্নপ্রবণতা ও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, বাঙ্গালী জীবনের বিশেষত্ব। যদি সামরিক বিভাগে বাঙ্গালীকে কোন স্বাধীন কার্য্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইত, তাহা হইলে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী—এই ভীরু বাঙ্গালীর মধ্য হইতেও ছুটিয়া আসিত, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মৃত্যুর ভীষণমূর্ত্তির সম্মুখীন হইত। মরণের ভয়ে তাহারা পলাইয়া আসিত না। এখনও যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, সামরিক বিভাগে কোন স্বাধীন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়াও তাহারা

ডাক্তার বা কমসরিয়েট বিভাগের কোন কর্ম্মচারী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পশ্চাৎপদ হয় না।

"মেকলের প্রবন্ধচয়ে যেখানেই জ্বলন্ত জীবন্ত বিমোহন চিত্রের বর্ণনা, সেইখানেই প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। বাঙ্গালীর চরিত্র-বর্ণনাকালে ঐতিহাসিক হইয়াও তিনি ভুলিয়াছিলেন যে, যে সকল সেনা লইয়া বিখ্যাত ইংরাজ বীর ক্লাইভ পলাশীর বঙ্গবিজয়ী সমরাঙ্গনে হতভাগ্য সিরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই এই শীর্ণকায় ভীরুস্বভাব বাঙ্গালী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, হাবড়ার সেতু পার হইবার সময় ষ্টিভেন্স্ সাহেব ইতিহাসের সত্যতা বিস্মৃত হইয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং আপনার বিষময়ী কল্পনাবলে সেই বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে এক নূতন উপন্যাসের সৃষ্টি করিলেন! প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে নূতনত্ব নাই; মেকলের পুনরুক্তি মাত্র। আমার স্মরণ হয়, তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত বয়ন যুদ্ধের পরিণাম অনুসারে আইরিস্ সৈনিকদিগের কাপুরুষতা সম্বন্ধেও প্রবন্ধ বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু সে স্থলেও তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, আইরিস্ অশ্বারোহিদল সেই সমরক্ষেত্রে কিরূপ অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল এবং আইরিস্ পদাতিকগণ কিরূপ অসামান্য রণপাণ্ডিত্যে পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি আরও বিস্মৃত হইয়াছিলেন, লেসলিযুদ্ধের শিক্ষিত কৃতকর্ম্মা সৈন্যদল এবং প্রসিদ্ধ ত্রিংশবর্ষব্যাপী মহাসমরের সমর-পারদর্শী স্বজাতীয় বীর-পুঙ্গবগণ ডন্‌বারের প্রসিদ্ধ সমরাঙ্গনে ক্রমওয়েলের ক্ষুধাক্লিষ্ট সৈন্য-সম্প্রদায়ের নিকট অপমানিত হইয়া কিরূপ ভাবে পলায়ন করিয়াছিল, সে কথা ঐতিহাসিকের নিকট অধিক দিনের কথা নহে।"

অপক্ষপাতী ইংরাজ-বর্ণিত এইরূপ পরিচয়ের পরেও বাঙ্গালীর সাহসিকতা সম্বন্ধে পক্ষ-সমর্থনের জন্য প্রবন্ধ-বিস্তারের আবশ্যকতা নাই। এ স্থলে আমরা এইমাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার

করিব যে, বাহুবলে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ না হইলেও 'আদর্শ-মনুষ্যোচিত গুণগ্রামে তাহারা হীন নহে। "শারীরিক বলেই অদ্যাপি পৃথিবী শাসিত হইতেছে; কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ। মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতি-সম্পন্ন; সেই জন্য আজিও শারীরিক বলের এতটা প্রাদুর্ভাব। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই।"

যে মহাত্মার জীবন-কাহিনী বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে প্রসঙ্গে আমরা এই সকল অবান্তর-কথার অবতারণা করিয়াছি, বাঙ্গালী আজও কতদূর শৌর্য্যবীর্য্যশালী হইতে পারে, প্রতিকূল অবস্থাবিপর্য্যয়েও প্রতিভাশালীর প্রজ্ঞা কিরূপে বিকসিত হওয়া সম্ভব, তিনি তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

---

# কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### আনুষঙ্গিক কথা

কোন জাতির সভ্যতার পরিমাণ করিতে হইলে, স্বতঃই মনে উদয় হয়, সভ্যতার পরিমাণদণ্ড কোথায়? জ্ঞানগৌরবে, ধনাধিক্যে, না বীরবিক্রমে—অথবা এইগুলির সমবায়ে? শারীরিক বলে—না মানসিক গুণে? বিশাল জগতে যতগুলি জটিল সমস্যা আছে, ইহাও তন্মধ্যে একটি। তবে অনেকেই হয় ত অস্বীকার করিবেন না, শারীরিক বল মানবের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি হইলেও সভ্যতার সহিত উহার তত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই; উহা সভ্যতাবৃদ্ধির কোন উপায় বা উপকরণ হইতে পারে; কিন্তু সভ্যতা নহে। সিংহব্যাঘ্রাদি পশু ও মহাবল দুর্দ্দান্ত বর্ব্বর বন্যজাতিকে সভ্য বলা যায় না।

তবে কি মানসিক গুণেই সভ্যতার পরিমাণ নিরূপিত হয়? এবং যদি মানসিক গুণকেই সভ্যতা বলে, তবে সেগুলি কি এবং কিরূপেই বা তাহার প্রকাশ? উত্তরে বলা যাইতে পারে, মানবের মানসিক গুণ অসংখ্য;—শিল্পবিজ্ঞানে, কৃষিবাণিজ্যে, সাহিত্যদর্শনে এবং সর্ব্বোপরি

সাংসারিক ও ধর্ম্মজীবনে তাহার বিকাশ। কোন্ জাতি সভ্যতা-সোপানে কতদূর অগ্রসর, বুঝিতে হইলে, তাঁহাদের শিল্প-বিজ্ঞানাদি হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে আর একটি জিজ্ঞাস্য, শারীরিক বল সভ্যতাবৃদ্ধি বা সভ্যতালাভের কতদূর সহায়ক এবং কেনই বা আবশ্যক?

প্রত্যেক কার্য্যই শক্তিসাধ্য। বিদ্যানুশীলন করিতে হইবে, তাহাতে শক্তির প্রয়োজন; বিপৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহাতেও শক্তির প্রয়োজন; অপরকে রক্ষা বা সংহার করিতে হইবে, তাহাতেও শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু শারীরিক বলের সহিত মানসিক বলের কতটা সম্পর্ক? মহাবল হইলেই মনস্বী হইতে হইবে অথবা শারীর বলে শ্রেষ্ঠ না হইলে যে, মনস্বী হইতে পারে না, তাহা কদাচ নহে। ইংরাজ জাতি আজি নবীন সভ্যতার অগ্রণী। বীরবর নেলসন্ সেই বীরজাতির ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ। বাল্যে ও কৈশোরে তিনি দুর্ব্বল ছিলেন; বীরবিক্রমে যখন তিনি শীর্ষস্থানীয়, তখনও শারীর বলে বিশেষ বলীয়ান্ নহেন। যে ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিস রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপিত করেন, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যালিসন্ যাঁহাকে নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করিয়াছেন, শারীর বলে তিনিও যে অসাধারণ ছিলেন, তাহা নহে। যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যানী ও মরুপ্রান্ত এবং আমেরিকার বিশাল তুষারময় ক্ষেত্র ভেদ করিয়া জ্ঞানানুরাগ ও অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তিনিও যে একজন সবল বঙ্গবাসী অপেক্ষা বলশালী ছিলেন, তাহা নহে। এইরূপ ইতিহাসের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে অসংখ্য উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে, মহাবল না হইয়াও কত ক্লাইভ স্বদেশীয় সাম্রাজ্য সুবিস্তৃত করিয়াছেন,—কত ম্যাট্‌সিনি স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া জননীর বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছেন,—কত বেলযোনি

দুর্গম দেশ-দেশান্তে মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের ভগ্নাবশেষ নগরী হইতে প্রাচীন দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতেছেন! কত দুর্ব্বল ব্যক্তির মনস্বিতায় লৌহবর্ত্ম ও সমুদ্র আজি ইংরাজ জাতির বাহন; তাড়িততার তাঁহাদের দূত!

এইরূপ শত শত উদাহরণে দেখা যাইতেছে, মানসিক বিকাশের জন্য সিংহবিক্রমের আবশ্যকতা নাই! সিংহবিক্রমের আবশ্যকতা তখন, যখন কোন দুর্ব্বল প্রাণীর সংহার করিতে হইবে। আত্ম-রক্ষার্থ বা আত্মকর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যও সময়ে সময়ে উহার বিশেষ প্রয়োজন। প্রবল যখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, সেই অত্যাচার-নিবারণের উপায়-নিরাকরণার্থ প্রয়োজন মানসিক গুণ; অত্যাচার-নিবারণ শক্তিসাপেক্ষ। যখনই কোন মানসিক গুণের নিষ্পত্তির জন্য কার্য্যপ্রবৃত্তি—তখনই অল্পাধিক শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন। সেই শক্তি বা শারীর বল তখনই সভ্যতার সাধন-স্বরূপ। শিল্প-বাণিজ্য বা দর্শনবিজ্ঞান সর্ব্বত্রই এইরূপ। কিন্তু শারীর বলে বলী হইয়া, শিল্প-বিজ্ঞানাদির উন্নত সোপানে অধিরূঢ় হইয়াও, নির্জ্জিত বা বিজিত জাতির মৃত ও জীবিতাবশেষদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার বর্ব্বরতারই পরিচায়ক; বীরত্বের নহে। বীরত্বও সভ্যতার অঙ্গ। সুতরাং বলা যাইতে পারে, শারীর বল যে স্থলে মানসিক গুণের সহকারী নহে—তথায় উহা সভ্যতার অঙ্গ বা অবলম্বন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মনোবিকাশেই সভ্যতা-বিকাশ;—শারীর বল উহার পক্ষে ততক্ষণই প্রয়োজন, যতক্ষণ কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য তাহা সহকারী থাকে। রক্তধারায় পৃথিবী ভাসাইলে সভ্যতার যে অধিক অঙ্কুরোদ্গম হয়, সে বিশ্বাস একান্তই ভ্রান্ত—হেয়ও বুঝি!

মানসিক গুণই যখন সভ্যতা, তখন দেখা যাউক, সভ্যতালোকিত জগতের ইতিহাসে বঙ্গের স্থান কোথায়? বঙ্গবাসীর এমন কি মানসিক

গুণ আছে, যাহাতে তাহারা জগতের কোন শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন জাতির সভ্যতার পরিমাণ করিতে হইলে সাধারণতঃ সেই দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পবিজ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি সাংসারিক ও ধর্ম্মজীবন আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্যে বঙ্গের প্রকৃতি এমনই অনুকূল যে অল্পায়াসেই প্রচুর শস্য জন্মে; এবং কিরূপ প্রণালীতে তাহা উৎপাদিত হইতে পারে, বঙ্গের কৃষক সম্প্রদায় নিরক্ষর হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে।

শিল্প বা বাণিজ্য আদর্শ-সভ্যতা বা মানবজনোচিত উচ্চ গুণাবলীর মধ্যে গুণনীয় নহে। তবে শিল্পসম্বন্ধে এইবার বলা যাইতে পারে, ঢাকায় মসলিন, কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিকৃতির অনুকৃতি, চন্দ্রকোণার ধুতি-সাটী, মেদিনীপুর অঞ্চলের তসর ও গরদ, বীরভূম অঞ্চলের লৌহের গঠন, দিনাজপুর অঞ্চলের প্রাচীন গৃহাদির ভগ্নাবশেষ উচ্চ শিল্পের পরিচায়ক; তবে শিল্প ও বাণিজ্য পরস্পরের এক সূত্রে গাঁথা; যেন একবৃন্তে দুইটি ফুল। স্বাধীনতার বিমল বিভা ব্যতীত তাহা কোনক্রমেই স্ফূর্ত্তি পাইতে বা বিকসিত হইতে পারে না। এক্ষণে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, এখনই যেন স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে, হিন্দু-স্বাধীনতার সময়েই বা বঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল? তদুত্তরে আমরা এইমাত্র বলিব, সভ্যতা-প্লাবিত বর্ত্তমান যুগের শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞানোন্নতি আধুনিক সভ্যজাতি-দিগের চিরন্তন সম্পত্তি নহে। অন্যান্য দেশে কালে যাহা ঘটিয়াছে, বঙ্গের ভাগ্যেও যে তাহা কোনক্রমেই ঘটিত না. কোন্ যুক্তিবলে তাহা স্বীকার করিব? প্রাচীন কবির বর্ণনায়, পুরাতন নগরীর ভগ্নাবশেষে এবং প্রস্তর-লিপিতে বঙ্গসভ্যতার জলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে, সেই

প্রাচীনকালেও বঙ্গবাসী বৃক্ষের বল্কল পরিত না, অপক্ক ও অস্পৃশ্য আহারে রসনা পরিতৃপ্ত করিত না, যথেচ্ছবিহারী পশুর ন্যায় স্বজাতি বা হীনজাতির নিধনসাধন করিয়া আপনাদিগের পশু প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে নাই। শিল্প-বাণিজ্য যে লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপায়, তাহা বঙ্গবাসীরা সেই প্রাচীনকালেও বুঝিত; কিন্তু ইহাও তাহাদের প্রাণে গাঁথা ছিল, শিল্প-বাণিজ্য সম্পদ্‌বৃদ্ধির প্রধান সাধন, কিন্তু সম্পদ্—সভ্যতা নহে। আর বিজ্ঞানে? চারিদিকেই ধূয়া—বিজ্ঞানে বঙ্গ,—কেবল বঙ্গ কেন, সমগ্র ভারতবাসী চিরদিনই হীন! বিজ্ঞান বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন, বলিতে পারি না। সমুদ্রবক্ষে স্বচ্ছন্দে বিহারোপযোগী বাষ্পীয় পোত দ্রুতগামী বাষ্পীয় যান ও তাড়িত বার্ত্তাদি দেখিয়া যদি তাঁহারা বঙ্গবাসীকে বিজ্ঞানান্ধ বলেন, তাহা হইলে আমরা বলিব, তাঁহাদের প্রাচীন রোম বিজ্ঞানান্ধ ছিল; শুধু প্রাচীন রোম বা গ্রীস কেন, দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বে জগতে সকল জাতিই বিজ্ঞানান্ধ ছিল; কিন্তু কোন্ মোহন মন্ত্রবলে সেই সকল অন্ধজাতির সন্তানদিগের দিব্যচক্ষু ফুটিল? বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে অথবা কালবশে অথবা এই সকল তত্ত্ব কতকগুলি জাতির হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবার আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া? প্রকৃতিদেবীর যে দুর্ভেদ্য রহস্যজালের মধ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর তীক্ষ্ণ নখর ও দংষ্ট্রা থাকে, বাবুই পক্ষীর কুলায়নির্ম্মাণের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান জন্মে, বীবরের অপূর্ব্ব কৌশল সেতুবন্ধন-সামর্থ্য জন্মে, দূরদেশান্তে গমনাগমন ও অবস্থানের জন্য বিশেষ আবশ্যক স্থলে সেইরূপ ঐ সকল তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আমরা আবার বলিব, এই সকল বিজ্ঞানোন্নতি বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের চিরন্তন সম্পত্তি নহে; বঙ্গের ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকিলে এ দেশেও উহা অসাধিত থাকিত না!

যে বিজ্ঞানবলে প্রতীচ্য জাতি আজি প্রাচ্য জাতিদিগের উপর আপনাদের দুর্ব্বার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; যে বিজ্ঞানবলে বৃহৎ

বৃহৎ কার্য্যালয়-সকলই দেবালয়, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, অপরিজ্ঞাত ভূখণ্ডেও উন্নতির পতাকা উড়িতেছে; যে বিজ্ঞানবলে, তাড়িতে, বারুদে—সর্ব্বসংহারিণী শক্তির অবতারণা, বঙ্গে বিজ্ঞানদেবীর সেই মোহিনী ও সংহারিণী মূর্ত্তি বিকসিত হয় নাই সত্য। বিজ্ঞান, এখানে ভিন্নপথে চলিয়াছে। এখানে দেবীর তারিণী শান্তিময়ী মূর্ত্তি। বঙ্গের বিজ্ঞান অর্থতত্ত্ব নহে—শিল্প সম্পদ্ নহে—সমুদ্রবক্ষে স্বচ্ছন্দে বিহারের উপায় নহে—লোকক্ষয়কর প্রভাব-প্রকাশ নহে। বঙ্গের বিজ্ঞান পরমার্থ বিজ্ঞান—বঙ্গের বিজ্ঞান সংসার-ধর্ম্ম বিজ্ঞান—বঙ্গের বিজ্ঞান সুখ-শান্তি-বিজ্ঞান। সংসারে, সমাজে, জীবনে কিরূপ মানব-বৃত্তির উৎকর্ষ ও পরম শান্তিলাভ ঘটে, তাহাই বঙ্গের বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য! ধর্ম্ম ইহার পত্তন-ভূমি—ঐহিক সুখভোগ ইহার পার্শ্বস্তম্ভ—জাতীয় সাহিত্যে সেই মর্ম্মকাহিনী পরিব্যক্ত; মেঘমেদুর অম্বরে, কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে সেই প্রেমগীতি; গৃহে গৃহে দেবালয়ে তাহার নিত্যলীলা! বঙ্গবাসীর জীবন, প্রবাসে প্রিয়জনের স্মৃতি—শত কর্ত্তব্যের মধ্যেও সেই স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক—সুখসম্মিলনের জন্য বাসর-প্রতীক্ষা অপেক্ষাও বুঝি তাহা সুমধুর! বিরহ ব্যতীত মিলনে সুখ কোথায়! তাই বুঝি অসংখ্য অতুল্য গীতিকাব্য—গীতিকাব্যে বিরহ-সঙ্গীতের পূর্ণ বিকাশ!

বঙ্গের বিশেষ সম্পত্তি পারিবারিক ব্যবহার—তাহাকেই বঙ্গবাসীর হৃদয়ের পূর্ণ-প্রকাশ। দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়ে হৃদয়ের প্রেমনির্ঝরিণী শতধারায় উৎসারিত। আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সকলই প্রেমময়, পবিত্রতাময়। অসংখ্য আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া তাহাদের সংসার—সংসারের সুখশান্তিই তাহাদের জীবনের চরম-লক্ষ্য। সেই সুখ, বিলাসবাসনার চরিতার্থতায় নহে। সেই সুখ দয়ার বিকাশে, মমতা-প্রকাশেও সেই সুখ, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া জগৎ ভুলিয়া

প্রেমের সাধনায়। মলিন মর্ত্ত্যের নীচতা হীনতা আপনার অসীম প্রভাবেও সে স্থলে কঠোর আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারে না। বলি-রাজের যজ্ঞে বামনদেব ত্রিপাদভূমিগ্রহণকালে যেরূপ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, বঙ্গের ভক্তি এবং প্রীতিবাৎসল্যপ্রণয়ও সেইরূপ আপনার ক্ষুদ্রকায়ায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অধিকার করিয়া বসে।

বঙ্গের আত্মীয় কুটুম্ব অসংখ্য। মমতার এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই। তাই তাহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার। সেইজন্যই বুঝি অতিথি দেবতা। সেই জন্যই বুঝি বিশ্ব-প্রেম বিরল, মানবের ক্ষুদ্র প্রেমের ভাণ্ডার বিশ্ব-বিস্তারিত করিতে যাইলে বিলুপ্ত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। অথবা দরিদ্রের সম্বল বলিয়া সমধিক আদরের সামগ্রী।

বিশ্ব-প্রেম বিরল হইলেও বুঝি বঙ্গেই তাহার পূর্ণ বিকাশ। মানব কেন, পশু-পক্ষীতে সে প্রেম বিস্তারিত। যে দেশে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয় নিশান, বিশ্বপ্রেম সে স্থলে না থাকিলে আর কোথায় থাকিবে? বিদেশী বিধর্ম্মীকে প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন করিতে কয় জন পারিয়াছে! খৃষ্টীয় মিশনরীদিগকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রেমের অভিনয় করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহাদের প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

আর ধর্ম্ম-জীবন! ধর্ম্মাচরণ জীবনের একটি পৃথক্ কার্য্য নহে। ধর্ম্ম লইয়াই জীবন। ধর্ম্মের জন্যই জীবন। জন্মগ্রহণ হইতে শ্মশান-সৎকারের যবনিকাপাত পর্য্যন্ত—আদ্যোপান্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক। তাই বলিতেছি, তাহাদের জীবনটাই ধর্ম্ম লইয়া। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মধ্যে মধ্যে তাহাতে করুণ বা কঠোর ছায়াপাত হয় বটে; কিন্তু বীভৎস দৃশ্য প্রায়ই দেখিতে হয় না। প্রাণের গান একই সুরে বলিতেছে, হৃদয় ভরিয়া ভালবাস, মন খুলিয়া বিমল হাস, আর জীবন ভরিয়া কর্ত্তব্য কর। বঙ্গ প্রেমময়, কোমলতাময়, মানব-জনোচিত

সহৃদয়জনপূর্ণ আনন্দময় শান্তি নিকেতন! পৃথিবীর আজিও এতদূর সভ্যতা হয় নাই যে, আপনার পশু প্রকৃতির দুরন্ত পরিচয় না দিয়া এই সুখশান্তি-বিকাশ দেখিয়া মোহিত হইবে।

এ হেন বঙ্গে বীরপ্রবর কর্ণেল বিশ্বাসের জন্ম।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## নবদ্বীপ ও নবদ্বীপবাসী

বঙ্গের যে সকল বিভাগ বীরকীর্ত্তির বিমল গৌরবে বরণীয়, তন্মধ্যে নবদ্বীপ অন্যতম। নবদ্বীপের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই কত তেজোগর্ব্বের কথা, কত সাধনাসিদ্ধির সুমহতী কাহিনী, কত পুণ্যপবিত্রতা-পাণ্ডিত্যের বিকাশ-বার্ত্তা স্মরণে আইসে! আর মনে পড়ে, নদীয়ার সেই পূর্ণ-শশধর গোরাচাঁদের কাঙাল বেশের অতুল মহিমা! বঙ্গের যাহা সার সম্পত্তি, নবদ্বীপেই তাহার পূর্ণ-প্রকাশ। আমরা একে একে সংক্ষেপে সেই আলোচনাই করিব।

এখন আর সে নবদ্বীপ নাই। অতীত গৌরব-হ্রাসের সহিত ভাগীরথীর পুণ্যগর্ভে তাহার অধিকাংশই অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে নূতন নবদ্বীপ।

রাজধানীর নামানুসারে যেমন কোন কোন স্থলে সেই প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকে, নবদ্বীপ সম্বন্ধেও সেইরূপ! প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব নরহরি দাস বলেন,—

"নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় একগ্রাম।
যথা কোন রাজধানী স্থান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম॥"

কেহ কেহ বলেন, খ্রীষ্টীয় ৭।৮ম শতাব্দীতে নবদ্বীপ সমুদ্র-বেলা হইতে ক্রমে মানববাসভূমিরূপে উন্নীত হয়। পরে সেনবংশীয়দিগের রাজত্বসময়ে কি বীরত্বগৌরবে, কি শিক্ষাসভ্যতায় বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তদবধি বীরত্ব গৌরবে না হউক, পুণ্যপাণ্ডিত্যে নবদ্বীপ আজিও গৌরবভ্রষ্ট হয় নাই; সেনবংশীয় বা পালবংশীয় রাজাদিগের সময়ে নবদ্বীপের কিরূপ শোভা-সম্পত্তি ছিল, আমরা এ স্থলে সে কথার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বস্মৃতির তীব্র তাড়না সহ্য করিতে চাহি না। মুসলমানদিগের প্রবল অত্যাচারের সময়েও নবদ্বীপের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহারই একটু আভাস দিতেছি। কবি জয়ানন্দ বলেন,—

"নানাচিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী, নানা জাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত, দেউল, দেহারা, নানাবর্ণ বৃক্ষলতা॥
জয় জয় ধন্য, নদীয়া নগরী, অলকনন্দার কূলে।
কমলাভাষিণী ক্রীড়া করে তথা রাজিত বকুলমালে॥
প্রতি গৃহোপরে বিচিত্র কলস, চঞ্চল পতাকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল, অযোধ্যানগরী, বিজুরী ছটকি পড়ে॥
নাট পাঠশাল দীঘী সরোবর কূপ তড়াগ শোভন।
মাঠ মণ্ডপ সুচিত্রিত চত্বর কুন্দতুলসী আরোপণ॥
প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতি গলি নৃত্য-গীত আনন্দিত, প্রতি ঘরে বেদ-পাঠ॥
দ্বিজরূপ ধরি দেবতা গন্ধর্ব্ব জন্ম লভিলা নবদ্বীপে।
হইয়া দ্বিজনারী, ইন্দ্র বিদ্যাধরী, সঙ্গীত গঙ্গা সমীপে॥

স্বর্গ ছাড়ি যত গন্ধর্ব্বমণ্ডলী জন্মিল বৈশ্য-বনিতা।
দেব ঋষি মুনি দ্বিজ-রূপ ধরি অধ্যয়ন শ্রুতি গীতা॥
গোধূলি-সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খধ্বনি প্রতি ঘরে।
শ্বেতচামর ময়ূর-পাখা হাতে, চন্দ্রাতপ শোভা করে॥
ইষ্টকরচিত প্রাচীর প্রাঙ্গণ সুচিত্রিত গৃহদ্বারে।
হিঙ্গুল হরিতাল কাঁচা চাল চৌখণ্ডী চৌকাট সালে॥
শাল রসাল বিশাল স্তম্ভরাজিত চন্দ্রার্কতিলকে।
ময়ূর শুক সারস পারাবত সিংহ হংস শাবকে॥
ঘাটপাট সিংহাসন আসন চৌখড়ি ময়ূর-পাখা।
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা॥
ডাবের বাটা গুবাক সংপুট দর্পণ রসবাটিকা।
তাম্রহাণ্ডি রসপিত্তল কলস বারাণসী ত্রিপদিকা॥
শঙ্খ বাটাবাটি সর্ব্বাঙ্গ থাল রসময় রসখুরি।
তিরোহত গাড়ু তাম্রমুখী মণ্ডল শীতল পিত্তল ঝারি॥
ট্যার গাটাকড়ি হিরণ্যমাদুলী কেয়ুর কঙ্কণ নূপুরে।
হেমকিয়াপাতা বিক্রম মুকুতা কাশ্মীর দেশের খুরে॥
তবকসুর পানবাটা কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি।
পাটনেত ভোট সকলাতকম্বল শ্রীরামখানিজমকা॥
ভোভোট্টদেশের ইন্দ্র নীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা॥
লিখিতে না পারি যত দাসদাসী প্রেমের মন্দিরে থাটে।
যে যে দ্রব্য সব ভুবনদুর্লভ বিকায় নদীয়ার হাটে॥"

নবদ্বীপের সেই সুখশান্তির সময়ে মুসলমান অত্যাচারে এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণের ধন মান নিতান্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কবি বলেন,—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয় ।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে ।
ধনপ্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে ।
ঘরদ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী ।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত ।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন ।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে ।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিয়া মিথ্যাবাদ ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে ।
নিশ্চিন্ত না থাকিহ প্রমাদ হবে পাছে ॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা !
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে বর্ণময় প্রজা ॥
এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে লাগিল ।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল ॥
বিশারদ-সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
সবংশে উৎকল গেল ছাড়ি গৌড়রাজ্য ॥"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নবদ্বীপের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল, ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধূলাপুর বড়গঙ্গা পার॥"

নবদ্বীপ বঙ্গের বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান। স্বধু বিদ্যাচর্চ্চা বা শাস্ত্রালোচনা নহে—বিদ্যাদানের বিখ্যাত স্থান। পৃথিবীতে আর কোন দেশে এরূপ বিদ্যাদান প্রথা ছিল বলিয়া ত বোধ হয় না। বিদ্যার্থী আসিলে তাহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত না। অধ্যাপকমণ্ডলী ধনাঢ্য ছিলেন না; কিন্তু আপনাদের আহার্য্যের অংশ হইতেও শিক্ষার্থীকে আহার করাইয়া শিক্ষাদান করিতেন এবং শিক্ষার্থীও পিতৃনির্বিশেষে অধ্যাপককে প্রীতিভক্তি করিতেন।

নবদ্বীপের বিভব বিস্তারের কথা আলোচনা করিতে হইলেই এখানকার পাণ্ডিত্য-প্রভাবের কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। কামকলুষময় পৃথিবীর মধ্যে ভোগবিলাসিতা হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া জ্ঞানচর্চ্চা ও ঈশ্বরচিন্তায় চিত্তসমর্পণ করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত রঘুনাথ বিদ্যাদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া যখন বৃক্ষাদিকেই শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন, তখন তিনি মনে করেন নাই, সেই ব্যাকুলতার ফলে বঙ্গদেশ ন্যায়চর্চ্চার প্রাধান্যের অমৃতফল উপভোগ করিবে! আর মথুরানাথ সেই পার্থিব সুখভোগস্পৃহাহীন শিক্ষাগুরুর আদর্শ কোথায়? বিদ্যাদান ও ছাত্র-পালনই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। গৃহে অন্ন ব্যতীত আহারের উপকরণ নাই; রামনাথ বলিলেন, 'উপকরণের অভাব কি!' সরল

প্রাণের অকপট উচ্ছ্বাসে বলিলেন, 'সম্মুখের তিন্তিড়ী বৃক্ষ থাকিতে আমাদের অভাব কি?' ভোগবিলাস বর্জ্জিত, সদা সন্তুষ্ট সে সকল পরমপণ্ডিত ধর্ম্মজীবন মহাত্মগণ আজ কোথায়?

কিন্তু নবদ্বীপের প্রধান গৌরব, নদীয়ার পূর্ণশশধর শ্রীচৈতন্যদেব। একদিকে মুসলমানের দারুণ অত্যাচার, অন্য দিকে অনাচার, ব্যভিচার এবং ধর্ম্মহীন শুষ্কতর্ক বা বেদান্তবাদের বিকৃতি-বিভীষিকা! ধর্ম্মবিপ্লবের সন্ধিস্থলে, ধর্ম্মাচরণের সেই ঘোর প্রতিকূলতার মধ্যেও শ্রীচৈতন্যদেব করুণ প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত করিলেন। প্রথম প্রথম তাহাতেও যে নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন ঘটে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সেই সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে দেশের কঠোরকলুষতা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? সেই নির্ম্মল, মনোমোহন, উন্মাদন, প্রেমপ্রবাহে মুসলমানদিগের কঠোরতা পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল! নবদ্বীপ আবার নূতন শোভায় নবীন মাধুরীতে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার বা পূর্ণব্রহ্ম, এ স্থলে আমরা সে কথার সমালোচনা করিব না। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই-মাত্র বলিতেছি, তিনি অসাধারণ প্রেমিক ও ভাবুকরূপে অবতীর্ণ হইয়া, সর্ব্বজীবে দয়া, সর্ব্বদেবে পূজা, সর্ব্বভূতে প্রীতি ও প্রেমভক্তি বা যে বিশ্বপ্রেম দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব, অসাধারণ, অননুকরণ-সাধ্য। তাঁহার অপূর্ব্ব মাধুরীময় প্রেমধর্ম্মে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ ছিল না, হিন্দু মুসলমানের দ্বেষাদ্বেষ ছিল না, পণ্ডিত-মূর্খের পার্থক্য ছিল না, পাপি-তাপি ধনি-নির্ধন সকলেই সেই প্রেমময়ের প্রেমসুধাপানে তুল্যাধিকারী। এখন শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব একটা বীভৎস ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু চৈতন্যদেব স্বয়ং সেই ভেদজ্ঞান-বিদূরণের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহার একটু আভাস দিব। শ্রীচৈতন্যদেব একদিন বলিলেন,

"প্রকৃতি স্বরূপে নৃত্য হইবে আমার।" চৈতন্যদেব প্রকৃতিবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যদেব যখন প্রকৃতিবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না! তখন—

"কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অতি অলক্ষিত বেশ মনোহর॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু আর কোন চিহ্ন নাই॥
অতএব সবে চিনিলেন প্রভু এই।
বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই॥
সিন্ধু হইতে প্রত্যক্ষ কি হইল কমলা।
রঘুসিংহ-গৃহিনী কি জানকী আইলা॥
কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্ব্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তি সতী॥
কিবা ভাগীরথী কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া॥
এইমত অন্তোহন্যে সর্ব্ব জনে জনে।
চিনিয়া প্রভুরে আপনা সেই মানে॥
আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখিল যাহারা।
তথাপি দেখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা॥"

চৈতন্য তখন নাচিতে নাচিতে ভক্ত সকলকে আপনার স্তব পড়িতে বলিলেন। আর নিজে—

"ভাবাবেশে কখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী যেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥

ঢুলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাতে রেবতী যেন কাদম্বরী পানে॥
সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা নাচেন বিশ্বম্ভর।
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥

প্রকৃতি-রূপেতে নৃত্য অপূর্ব্ব-মাধুরী।
মোর স্তব পড় বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
জননী আবেশ বুঝিলেন সর্ব্বজনে।
সেইরূপে সবে স্তুতি পড়ে প্রভু শুনে॥

কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব কেহ চণ্ডীস্তুতি।
সবে স্তুতি পড়েন যাহার যেন মতি॥
জয় জয় জগত-জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥

জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরি।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্যে কে দিবেক সীমা॥

জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
যড়-বিদ্য'—সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।
'সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই॥

সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা-অবিকারা পরমা-প্রকৃতি ॥
জগত-আধার তুমি দ্বিতীয় রহিতা।
মহী-রূপে তুমি সর্ব্ব-জীব-পালয়িতা ॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন।
তোমা' স্মরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি স্থিতি
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননী, চরণের দিয়া ছায়া ॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা! কে রাখিবে আর ॥
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা! কর নিজ দাস ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব-ভূত বুদ্ধি।
তোমা' স্মরিলে সর্ব্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, বিষ্ণু ও শক্তিতে প্রভেদ নাই। একই শক্তি বিবিধরূপে প্রকাশ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের আর একজন উজ্জ্বল রত্ন। ইঁহারা ভবানীর বরপুত্র ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর। বঙ্গভাষার তাজমহল-নির্ম্মাতা ভারতচন্দ্র এই সভার শোভা বৃদ্ধি করিতেন। এই সকল সুখসম্পদের কথার মধ্যে নদীয়ার বিশ্বাসবংশের মহত্ব ও আত্মসমর্পণের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না! কুক্ষণে নদীয়ায় নীলের আবাদ

হইয়াছিল ; বাঙ্গালীর রক্তে নীলের ভূমির উর্ব্বরতা সাধিত না হইলেও অজস্র রক্তপাতে ভারতের ইতিহাস রঞ্জিত হইয়াছে। নীলকরগণ নদীয়ায় নীলের আবাদ উপলক্ষে নিদারুণ অত্যাচার অনাচার করিত, রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই তাহাদের সুহৃদ্ সহায়, কিন্তু নদীয়ার বিশ্বাস-বংশ ধনবলে বলী না হইলেও প্রবল পরাক্রমে নিষ্ঠুর-প্রকৃতি নীলকর-দিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। নীলকরগণ নদীয়ায় যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে সেরূপ নৃশংসতা নিতান্ত বিরল। ইংরাজের রাজ্যে সুসভ্য ইংরাজ-জাতীয় হইয়া তাহারা যেরূপ বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে, সাধু-প্রকৃতি ইংরাজগণ সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে আপনাদের স্বজাতীয় বলিতে কুণ্ঠিত হন। সে যাহা হউক, বিশ্বাসবংশ সেই দারুণ নিষ্ঠুরতার প্রতিকূলতা-চরণ করিতে গিয়া অনেকে গৃহ-দ্বার শূন্য হইয়াছেন, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তথাপি সেই দানবোচিত দুর্ব্বৃত্ততার প্রতিকূলতাচরণে পরাঙ্মুখ হন নাই। বিনাপরাধে গৃহলুণ্ঠন, গৃহদাহ, প্রাণসংহার, এমন কি, অসহায়া গর্ভিণী রমণীকে পদাঘাতে নিপাতিত বা সতীত্বনাশ করিতে দেখিয়া কোন্ মানবসন্তান নীরব নিস্পন্দ থাকিতে পারেন ? বিশ্বাসবংশের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং ধন-প্রাণদানে অবশেষে ইহার প্রতিবিধানের তুমুল আন্দোলন উঠে এবং সদাশয় ইডেন্ ও সুপ্রসিদ্ধ লং সাহেব প্রভৃতির সহায়তায় সেই অমানুষিক নৃশংস আচ-রণের তিরোধান ঘটে। এই বিশ্বাসবংশেই আমাদিগের নায়ক শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের জন্ম।

এখন নানাকারণে নবদ্বীপ শ্রীভ্রষ্ট, অধিবাসীগুলি ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত ; তথাপি শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের "গোড়ে গোয়ালা"গণ এখনও লাঠির খেলায় অনেক বীরের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে। 'বোদে' ও 'বিশে' ডাকাতের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী

এখন উপন্যাসরূপে দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু এখনও মতিয়াবির রামদাস বাবুর বলবিক্রম, বাহুবলের একটি সামান্য উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## নাথপুরের বিশ্বাস

নদীয়ার রাজধানী কৃষ্ণনগরের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে ইচ্ছামতী-নদীতীরে নাথপুর নামে একটি পল্লীগ্রাম আছে। তথাকার বিশ্বাসবংশ ধন-গৌরবে না হউক, বহুকাল হইতে নদীয়া অঞ্চলে বিশেষ মান্যগণ্য। এই প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশ অতুল ধনাধিপতি নহে, বড়লোক বলিয়া অসামান্য অহঙ্কারে গর্ব্বিত নহে, কিন্তু সমগ্র নদীয়া অঞ্চলে জনসাধারণের নিকট তাঁহারা সুপরিচিত। তাঁহাদের খ্যাতি ভদ্রোচিত আচারব্যবহার ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের সমাবেশ, সুতরাং সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। তাহা দুদিনের অস্থায়ী খ্যাতি নহে যে, নিমেষে ফুরাইবে। সুরেশচন্দ্রের পিতামহ রামচাঁদ বিশ্বাস জমিদার বলিয়া গণ্য ছিলেন।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে সুরেশচন্দ্র এই সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। গিরিশ বাবু বিশেষ ধনাঢ্য ছিলেন না। তিনি গবর্ণমেণ্ট আফিসে সামান্য বেতনের কার্য্য করিতেন। যখন গোরাচাঁদের প্রেমের তরঙ্গে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়" সেই সময় হইতেই বিশ্বাসবংশ এই শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসক। গিরিশ বাবু কোম্পানীর কর্ম্ম করিতেন; সুখশান্তিময় স্বগ্রামে অবস্থান তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন

ঘটিয়া উঠিত না। পরিবারগণ স্বদেশেই থাকিত। স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রবাস তখনকার রীতি ছিল না; সুতরাং সে কালের পল্লীগ্রামগুলিও শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই। অর্থোপার্জ্জনের জন্য যিনি যেখানেই কর্ম্ম করুন না কেন, সেখানে কেবল উপার্জ্জনের জন্যই অবস্থান করিতেন; কিন্তু সর্ব্বদাই মনে জাগিত, সেই প্রিয় জন্মভূমি, যে স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যে স্থানে তাঁহার প্রিয় পরিজনবর্গ ও পূর্ব্বপুরুষগণের চরণরেণু বা কীর্ত্তিকাহিনী বর্ত্তমান, যেখানে কপট আত্মীয়তায় অপরকে ভুলাইয়া আত্মীয়বৎ করিবার আবশ্যক হয় না! আর সেই প্রবাসের পর প্রিয়পরিজনের মিলন বড়ই সুমধুর ছিল। তখন স্নেহমমতা মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রবাসের দীর্ঘদিনযামিনীর সুখদুঃখময়ী স্মৃতি দূরীভূত করিত। নগরের বিলাসবিভ্রম তখন জনসমাজের হৃদয় এতদূর কলুষিত করে নাই। সে কাল গিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রেরা চারি ভাই, গিরিশ তন্মধ্যে তৃতীয়। গিরিশ বিশ্বাস কলিকাতা সার্ভেয়ার জেনারেল্ আফিসে চাকুরী করিতেন। গিরিশচন্দ্রের দুই পুত্র ও তিন কন্যা; সুরেশচন্দ্রই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ মন্মথ। মৃত্যুকালে সুরেশচন্দ্রের বয়স হইয়াছিল ৪৫ বৎসর মাত্র! তিনি জীবনে যেরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, যেরূপ বিপদ্‌রাশি অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং পরে যেরূপ গৌরবে গৌরবান্বিত, তাহা অসামান্য, অসাধারণ এবং এবং প্রকৃত বীরোচিত।

সকল দেশের সর্ব্বসময়েই মনস্বি ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, বালক ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যক্তি হইবে, প্রথম হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সুরেশচন্দ্রের জীবনেও তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত। বাল্যকাল হইতেই সুরেশচন্দ্র ভয় কাহাকে বলে, জানিত না। প্রসিদ্ধ ইংরাজবীর নেলসন্ সাহেব বাল্যকালে পাখীর বাসা ভাঙ্গিতে বাহির হইলে, স্নেহময়ী জননী কর্ত্তৃক ভয় প্রদর্শিত হইলে যেমন বলিয়াছিলেন, 'ভয় কি মা!'

সুরেশচন্দ্রও তদ্রূপ বাল্যকালে সঙ্কটময় ঘটনাতেও আভাস দিয়াছেন, 'ভয় কাহাকে বলে!' সে নির্ভীকতা নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রসূত নহে, প্রকৃতি-বশে। তিনি জানিতেন, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলে হস্ত পুড়িয়া যায়; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও আবশ্যক বোধ হইলে তাহাতে বিমুখ হইতেন না।

সুরেশচন্দ্র বাল্যে বড়ই চঞ্চল ছিলেন; যখন যে দিকে যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইত, সহজে তাহা হইতে বিরত হইতেন না। প্রবল ব্যক্তির বাধায় অগত্যা নিবৃত্ত হইতে হইলে বিষম ক্রোধে ও অভিমানে তখন বালক সুরেশের চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত; কিন্তু সদ্ব্যবহারে বালক আবার তেমনই বশীভূত। সুরেশ শাসন সহ্য করিতে পারিতেন না, অথচ একটু সহাস্যমুখে একটি মিষ্ট কথায় বালক সুরেশচন্দ্র একেবারে শিষ্ট-শান্ত, নিতান্ত আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িতেন!

সুরেশচন্দ্রের সমবয়স্কদিগের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব, সুরেশ চন্দ্রের নিকট তাহা সহজসাধ্য ছিল। এইরূপে প্রায় প্রতিদিনই বালক সর্ব্বাঙ্গে অল্পাধিক আঘাত পাইত। আজ উচ্চাসন হইতে পড়িয়া গিয়াছে, আজ কাটিয়াছে, এইরূপ ক্ষতবিক্ষত হওয়া তাঁহার বাল্য জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা। কিন্তু তজ্জন্য তাহার মুখে কষ্টচিহ্ন বা বালক-সুলভ ক্রন্দন কদাপি শুনা যায় নাই। লাগিয়াছে লাগুক, কাটিয়াছে কাটুক, তাঁহার গ্রাহ্যের মধ্যে আসিত না; অত্যুচ্চ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান, অতিরিক্ত দৌড় ও বৃক্ষারোহণ এ সকল হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরোধী ছিল!

কতকগুলি ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, তাহারা প্রভুত্ব করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আজ্ঞাবাহক নহে। সুরেশচন্দ্রের বাল্যকাল আলোচনা করিয়াও সেইরূপ বোধ হয়, তিনি প্রভুত্ব করিতেই জন্মিয়াছেন, অধীনতা করিতে নহে।

বাল্যকালে তিনি কোন সঙ্গী সহচরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন না, কিন্তু দলে দলে সমবয়স্ক বালক আসিয়া সুরেশচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইত, এবং তাঁহাকে আপনাদের "নেতা" মনে করিত।

---



# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## বাল্যঘটনা

বালকের অস্ফুট-জীবনে ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। বালকের হাসিকান্না ও খেলা-ধূলার মধ্যে যে বিশেষত্বটুকু থাকে, তাহা সকল সময়ে সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বটে, কিন্তু বিশেষ প্রতিকূলতা না ঘটিলে কালে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ছায়া দেখিয়া কায়া-নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে। অথচ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অনুধাবন করিলে নিতান্ত দুঃসাধ্যও নহে।

সুরেশচন্দ্রের সেই সুকুমার শৈশবে যে বিশেষত্বের আভাস পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহা পরিস্ফুট বা পরিব্যক্ত; কিন্তু বালকের সেই অস্থিরতা, অসাধারণ দুঃসাহস ও সহগুণ তখন কয়জনের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিল যে, সেই বালসুলভ প্রকৃতির গূঢ় বিকাশেই বর্ত্তমান পরিণতি!—বীজের অভ্যন্তরে যেরূপ গুপ্ত অগোচর অন্তঃশক্তি নিহিত থাকে, মনুষ্য-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও তাহার সুস্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়।

বাল্যকাল হইতেই সুরেশচন্দ্রের জীবনে লক্ষিত হইত যে, তিনি পরিণত বয়সে অকুতোভয় এবং অপূর্ব্ব সহনশীল হইবেন, প্রত্যেক ঘটনায় তাহা অল্লাধিক পরিব্যক্ত। বালকের অগ্নিশিখা দর্শনে

আনন্দোচ্ছাস বিচিত্র ঘটনা না হইলেও সুরেশচন্দ্রের তাহাতে একটু অসাধারণত্ব ছিল এবং বালক-সাধারণের লোহিতোজ্জ্বল অগ্নি বা দীপশিখা দর্শনে যে আনন্দ, তাহা বালসুলভ হইলেও সম্ভবতঃ উহার একটি বিশেষ কারণ আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই আনন্দের মূলে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বর্ত্তমান; হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য বালক সেই আকর্ষণে মোহিত বা বিদগ্ধ হইতে পশ্চাৎপদ নহে। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধগণও কি সৌন্দর্য্যের প্রদীপ্ত শিখায় বহ্নিমুখে পতঙ্গ-পতনের ন্যায় স্বেচ্ছায় দগ্ধাবশেষ না হইয়া বিরত হইতে পারেন?

যাহা হউক, সুরেশচন্দ্রও অগ্নির সহিত ক্রীড়ায় একান্ত আগ্রহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্নেহময়ী জননী সদাই শঙ্কিতা; অবাধ্য অবোধ সন্তান আগুন লইয়া কখন্ কি করিয়া বসে! কিরূপে অগ্নি বা দীপশিখার উপর সন্তানের ভয় জন্মাইয়া দিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবশেষে স্থির করিলেন, আগুনের তাপ লাগিলে বালক হয় ত আর আগুনের নিকট যাইবে না। এইরূপে তিনি আগুনের উপর সন্তানের ভয় জন্মাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্ম করিতে হইবে, সুশীল সুরেশ সঙ্গে থাকিলে তাহা কোন মতেই হইবার নহে, অথচ গৃহে এমন কেহ নাই, যাহার নিকট রাখিয়া মা'র প্রাণ স্থির থাকিতে পারে। অন্ধকার গৃহে বালককে একাকীই বা কিরূপে রাখা যায়; আবার প্রজ্বলিত দীপালোকেই বা কোন্ প্রাণে রাখিয়া যাইতে পারেন। তখন কেরোসিন ল্যাম্পের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই এবং এরূপ সম্পত্তিশালীর গৃহও নহে, যে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিবে। তখন ঘটনাক্রমে সুরেশচন্দ্রের মাতা স্থির করিলেন, আগুনের উপর ভয় জন্মাইয়া তিনি গৃহকার্য্যে যাইবেন। গৃহের এক কোণে সেই "সনাতন" দীপ জ্বলিতেছিল। সন্তানকে কোলে লইয়া সুরেশচন্দ্রের মাতা সেই দীপের দিকে

অগ্রসর হইলেন, সুকুমার শিশুর সেই কোমল করপল্লবগুলি নাচাইতে নাচাইতে সেই দীপশিখার নিকটে ধরিলেন। মা'র কোলে নির্ভয় বালক হস্ত আরও বাড়াইয়া দিল। হস্তে বিলক্ষণ উত্তাপ লাগিল; কিন্তু বালকের রোদন বা চক্ষুকোণে অশ্রু বিন্দুমাত্রও নাই! মা মনে করিয়াছিলেন, সামান্য উত্তাপ লাগিলেই বালক কাঁদিয়া উঠিবে বা হস্ত সরাইয়া লইবে, কিন্তু তাঁহার সে বালক নহে। বালক অগ্নিতে হস্ত বাড়াইয়া রাখিয়া হাসে নাই বটে, কিন্তু তাহার মুখে যন্ত্রণার কোনরূপ চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই! কাতরতার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র অপূর্ব্ব নীরবতা! কিন্তু মা'র প্রাণ তখন কত কাঁদিয়াছিল, কে বলিবে? সন্তানের অদ্ভূত সহগুণ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া সেই, অবধি তাঁহার শাসন-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভীষণ অগ্নিময় সমর-ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্র যে নির্ভয়ে অগ্নিক্রীড়া করিবেন, এই সামান্য ঘটনাতেই যেন তাহার সূচনা!

সুরেশচন্দ্রের বয়স যখন দুই বৎসর মাত্র, তখন হইতেই তাঁহার নির্ভীকতা ও দুঃসাহসের অদ্ভূত পরিচয় পাওয়া যায়। দুই বৎসরের শিশু একাকী খেলা করিতেছে, অকস্মাৎ নিকটবর্ত্তী প্রাচীরগাত্রে একটি "মৈ"এর দিকে বালকের দৃষ্টি পড়িল, বালক উহার নিকটবর্ত্তী হইল, একে একে উহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিল; উহা ভূমিতল হইতে ২০ ফুট উচ্চ। বালক উচ্চে উঠিয়া একবার নিম্নে যেমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আর অতুল আনন্দে সেই কচি কচি হাত দুখানি নাচাইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে করতালি দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থহীন আনন্দ সঙ্গীত! বালকের আনন্দ-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া সুরেশচন্দ্রের মাতা ও আত্মীয়স্বজন সেই স্থানে আসিয়া পড়িলেন। বালকের কাণ্ড দেখিয়া সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। একটু অসাবধান, ভারবৈষম্য বা দুর্ম্মতি ঘটিলেই ভগবান্ যে কি দুর্ঘটনাই ঘটাইবেন, সকলে সেই আশঙ্কা করিতেছেন!

২০ ফুট উচ্চ হইতে সেই দুই বৎসরের শিশু ভূমিতলে পড়িলে আর কি তাহাকে পাওয়া যাইবে! এদিকে আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া আনন্দ বাড়িয়া উঠিল; হর্ষোৎফুল্ল বালক সুকুমার গ্রীবা বাঁকাইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে করতালি দিতে লাগিল! সকলেই ভীত—বিপদের আর বিলম্ব নাই। এইবার হয় ত পড়িল—কেহ যে সেই "মৈ"এ উঠিয়া বালককে নামাইয়া আনিবে, তাহাও একরূপ অসম্ভব। কেন না, হয় ত উঠিতে গেলেই সিঁড়ি সামান্য নড়িবে; সেই সামান্য কম্পনে সুরেশের পদস্খলন হইতে পারে! অথবা কাহাকেও উঠিতে দেখিলে উন্মত্ত সুরেশ তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে কি না, কে বলিতে পারে! সুরেশচন্দ্রের জননী সন্তানকে যতই স্থির হইয়া বসিতে বলিতেছেন, সুবোধ শিশুর সঙ্গীতভঙ্গী ও আনন্দোচ্ছ্বাস ততই বাড়িতেছে। ভয় দেখাইয়া বা ভর্ৎসনা করিয়া সুরেশকে কোনরূপে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া তখন তিনি স্নেহ কাতরবাক্যে সুরেশকে ক্ষণেকের জন্য শান্ত হইতে অনুনয় করিলেন। ক্লান্তিবশেই হউক, অথবা মাতার কাতরতাতেই হউক, সুরেশচন্দ্র স্থির হইয়া বসিল। তখন কয়েক ব্যক্তি সেই "মৈ"খানি দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিল, যেন কম্পিত বা বিচলিত না হয়, এবং একজন ধীরে ধীরে উহাতে উঠিয়া সুরেশচন্দ্রকে নামাইয়া আনিল। তখন সুরেশচন্দ্রের মাতা যেন হারানিধি পাইয়া বালককে কোলে লইলেন, এবং ব্যাকুল আগ্রহ ও আবেশভরে কতই চুম্বন করিলেন। মা'র প্রাণের ব্যাকুলতা কে বর্ণনা করিবে! বিশেষতঃ সুরেশচন্দ্রের ন্যায় শান্তশিষ্ট শিশুর জননীর সদাই ভাবনা, খেলার ছলে বালক কখন্ কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসে!

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## বিড়াল বিরোধ

নিতান্ত শৈশবে সুরেশচন্দ্র আর একবার যে বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিব। এই বিভ্রাট বিড়ালের সহিত বিরোধ ঘটিয়াছিল। পল্লীগ্রামের বিড়ালগুলি নাগরিক বিড়ালের ন্যায় নিতান্ত শান্তশিষ্ট নহে। স্থলবিশেষে তাহাদের বন্যপ্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত সহরের বিড়ালগুলির একমাত্র শীকার ইন্দুর ; আবার সহরের ইন্দূর এত বড় থাকে, যে 'সহুরে' বিড়ালদিগকে সময়ে সময়ে সেই শীকারের আশাও ছাড়িতে হয়। সুতরাং সহরের বিড়ালগুলি শীকারের অভাবে ক্রমশঃ আপনাদের হিংস্রস্বভাব কতকটা ভুলিয়া যায়। কিন্তু পল্লীগ্রামের মুক্তপথে বিবিধ পক্ষী শশক, কাঠবিড়াল প্রভৃতি অগণ্য শীকার থাকাতে তাহাদের শীকারবৃত্তির পরিচালনা হইয়া থাকে। কেন যে, বিড়ালদিগকে "বাঘের মাসী" বলে, ইহাদিগের শীকার-প্রণালী দেখিলে অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

একবার আমরা পল্লীগ্রামে একটি কুকুর ও বিড়ালের "দ্বৈরথ যুদ্ধ" দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। ক্ষুদ্রকায় বিড়ালের সেই তর্জ্জন-গর্জ্জন ও অপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকৃতই সুকৌশলসম্পন্ন। কুকুরটি প্রথমে যেন কৌতূকচ্ছলে একটি বিড়ালকে আক্রমণ করিল। কিন্তু যখন চীৎকার ও গর্জ্জন করিতে করিতে পূর্ণ-বিক্রমে সেই ক্ষুদ্রকায় তীক্ষ-নখর-দর্শন বিড়ালের উপর আপতিত হইল, তখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেজ

গুটাইয়া হটিতে হইল। কিয়ৎক্ষণপরে আবার পূর্ণবলে যেমন আক্রমণ, অমনি বিড়ালের নখরাঘাতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তন। আমরা কৌতূহলী হইয়া সেই বিষম বিরোধ দেখিতেছিলাম; কেহ কেহ বিবাদ-নিষ্পত্তির জন্য উভয়কেই নিবৃত্তি করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; কিন্তু আমরা কৌতূহলী হইয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্তি করিয়া বলিলাম, 'এই উদ্যোগ হইতে বিরত হউন, যুদ্ধকাণ্ডটাই দেখা যাক্।' প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সেই সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে সেই তর্জ্জন-গর্জ্জন, লম্ফন কুণ্ডলন চলিতে লাগিল! অবশেষে কুকুরের মুখ ও গ্রীবাদেশ ক্ষতবিক্ষত হইলে সে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল! বিড়ালটি তখন পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর পশ্চাদনুসরণ করিল না বটে, কিন্তু বিজয়লাভে লাঙ্গুল ফুলাইয়া বিজয়নাদ করিতে করিতে অপূর্ব্ব গৌরবভরে আপন বিজয়ানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

যাহা হউক, সুরেশের কথা বলি। একদিন একটি প্রকাণ্ড বিড়াল একটি বিল্ববৃক্ষে উঠিয়া একটি কাঠবিড়ালী শীকার করিয়া ভূমিতলে আনয়ন করে। কাঠবিড়ালীর ক্ষীণপ্রাণ তখনও শেষ হয় নাই বটে, কিন্তু তখন গ্রীবাদেশে রক্তধারা, জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিড়ালটি লাঙ্গুল কুণ্ডলিত করিয়া উহার বক্ষে বসিয়া আছে এবং উহার সামান্য শরীরসঞ্চালনাদি দেখিলেই তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তাহার পরিশেষ করিতেছে। বিড়ালটা যখন এইরূপে আপনার মধ্যাহ্ন-আহার সংগ্রহ করিয়া ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল কাঠবিড়ালীর উপর বসিয়া আপনার দারুণ হিংস্র ও বন্যপ্রকৃতির পূর্ণ-পরিচয় দিতেছিল, অবোধ শিশু সুরেশচন্দ্রের তখন ঘটনাক্রমে সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। অশান্ত বালক কাঠবিড়ালী লইবার জন্য অগ্রসর হইল। বালক জানে না, বিজয়ী বীর আপনার বিজয়াধিকার বিনা বাধায় পরিত্যাগ করিবে না! বালক যেমন সেই রক্তাক্তকলেবর কাঠবিড়াল লইতে হস্ত প্রসারণ করিল, বিড়ালটি

অমনই তাহাকেই আক্রমণ করিল। এই বিড়ালটির সহিত সুরেশের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল; সুরেশচন্দ্র আপনার আহারের কিয়দংশ প্রত্যহই বিড়ালটিকে উপহার দিত।

কিন্তু বিড়ালের আবার কৃতজ্ঞতা! সে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সুরেশকে আক্রমণ করিল। সুকুমার শিশু, দুঃ—দুঃ বলিয়া বিড়ালটাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বালকের কথায় বিড়াল কর্ণপাত করিল না। বালকের চিরাভ্যস্ত দুঃ—দুঃ উপেক্ষা করিয়া সেই কোমল করপল্লব দুইখানি ক্ষতবিক্ষত করিল; বালকও সেই রক্তাক্ত হস্তেই সাধ্যমত বাধা দিতেছিল। কিন্তু সাধারণ বালকের ন্যায় চীৎকার বা ক্রন্দন করিয়া সুরেশচন্দ্র আপনার সঙ্কল্প ও কর্ত্তব্যসাধনে বিরত হয় নাই। সেই দারুণ নখর-প্রহার অন্য বালকে সহ্য করিতে পারিত না। সুরেশচন্দ্রের জীবন যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে আরও কিয়ৎক্ষণ সেইরূপ আঘাত-প্রতিঘাত চলিলে যে কি ঘটিত, স্মরণ করিলেও আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে! যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে একজন সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বালকের জীবন রক্ষা করে। যে সুরেশচন্দ্রের শৌর্য্যবীর্য্যে আজ ভীরু কাপুরুষ বঙ্গবাসীর নাম স্বদেশে বিদেশে সম্মানিত, ভীষণ ধূমাচ্ছন্ন বজ্রনাদী কামানের ক্রীড়াস্থলে যিনি বিপুল বিক্রমে বিহার করিতেছেন, ঘটনাবশে একটি সামান্য বিড়ালের নখরাঘাতে তাঁহার জীবন অকালে ফুরাইতে বসিয়াছিল! সুরেশচন্দ্র সেই দারুণ প্রহারে কয়েক মাস শয্যাগত ছিলেন; সময়ে সময়ে তাঁহার জীবনাশাও ছিল না! কিন্তু জননী ও জন্মভূমির সৌভাগ্যক্রমে বহুকষ্টে তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## বালকের প্রকৃতি

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের শৈশবপ্রকৃতি পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইতে লাগিল। নিতান্ত শিশুকালের সেই অস্থিরতা ও নির্ভীকতা এখন সমধিক বিকসিত হইয়াছে। ইতিহাস-পাঠকদিগের অবিদিত নাই, সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব-স্থাপয়িতা শিবাজী, দাদাজীর মুখের দিকে চাহিয়া সতৃষ্ণনয়নে অতুল আগ্রহভরে কিরূপে ভারতগাথা শুনিতেন, এবং সেই অতুল বীরকাহিনী কিরূপে বালকের ভবিষ্য-জীবন গঠিত করিয়াছিল! আমাদের সুরেশচন্দ্রও সেইরূপ বিবিধ বীরবিক্রম, দুর্গাধিকার, দেশবিজয় বা রণরঙ্গকাহিনী শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বালক পুস্তক স্পর্শ করিবে না, শ্লেট ধরিবে না, কিন্তু মহাভারত বা রামায়ণের বীরত্ব ইতিহাস পরমাগ্রহে শ্রবণ করিবে! শুধু শ্রবণ নহে, অর্জ্জুনের অপূর্ব্ব বীরকীর্ত্তি, ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞা, রামচন্দ্রের দুর্জ্জয়শত্রু রাবণসংহার প্রভৃতি বালকের মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা থাকিত, শত্রু-সাগরের মধ্যে বিবিধ প্রতিকূল ঘটনায় যখন তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ বা স্মরণ করিত, বালকের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিত; চক্ষুতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইত। কেবল পৌরাণিক বীরকাহিনী যে সুরেশ-চন্দ্রের প্রীতিবিধান করিত, তাহা নহে, কি স্বদেশের, কি বিদেশের— প্রাচীন বা বর্ত্তমানকালের যে কোন বীরকীর্ত্তি শুনিতে তাহার অসীম আগ্রহ, অপার তৃপ্তি। আলেক্‌জাণ্ডারের দিগ্বিজয়, লিওনিডাসের স্বদেশ-রক্ষা, সিজার ও হানিবলের বীরবিক্রম, অ্যালফ্রেড্‌ ও হেরাল্ড,

ব্রুস ও ওয়ালেস্, নেপোলিয়ন্ অথবা ওয়াসিংটনের শৌর্য্যবীর্য্য শ্রবণে বালকের হৃদয় নাচিয়া উঠিত!

ইংরাজী-শিক্ষা তখন ভারতে এতদূর প্রসারিত হয় নাই। এখন যেমন জেলায় জেলায় বহুসংখ্যক কলেজ-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। সমগ্র বঙ্গে তিনটি মাত্র উচ্চশিক্ষার স্থান ছিল; হুগলী কলেজ, হিন্দুকলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ। সুতরাং এই সকল কলেজে নানাস্থান হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। বালক সুরেশচন্দ্র স্বগ্রামের এই সকল কলেজের ছাত্রদিগের সহবাস বড় ভালবাসিতেন। তাহারা কলেজে কি শিক্ষা পাইল, সুরেশচন্দ্রের তাহা শুনিতে বা শিখিতে অভিলাষ নহে। সুরেশচন্দ্র তাহাদের অবসরমত অসীম আগ্রহে শুনিতে চায়, বীরকাহিনী। কিরূপে, কোন্ দেশে, কোন্ বীরপুরুষ অপূর্ব্ব বীরত্বে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা একমনে শুনিতে একান্ত আনন্দানুভব করিতেন।

শিবাজীর ন্যায় সুরেশচন্দ্রেরও বালকের দল ছিল। তবে ইহাদের কার্য্য ছিল বালক নেল্সনের ন্যায় বাগানে ফলমূল লুণ্ঠন, পক্ষিশাবক সংগ্রহ, এবং ইচ্ছামতীতীরে 'বাঙালীর মৃগয়া'—'মাছধরা'! সহচরঅনুচর-দিগের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের অসীম প্রভাব; তাঁহার তর্জ্জনী-তাড়নে সকলেই তটস্থ। এইরূপে বাল্যকালেও তিনি আপন সম্প্রদায়ের নেতা বা অধিনায়ক ছিলেন।

বালকসুলভ ছুটাছুটি বা বিবিধ উপদ্রবে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সুরেশচন্দ্র বিজ্ঞের ন্যায় সতরঞ্চ লইয়া বসিতেন। হয় ত খেলিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই; কিন্তু আপনিই উভয় পক্ষের সতরঞ্চ-বাহিনী সাজাইয়া স্বেচ্ছামত একটি জয়-পরাজয়ের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। এইরূপে বাল্যের প্রতি সামান্য ঘটনাতেও তাঁহার ভবিষ্য-জীবনের অনুকূল ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়!

ছয় সাত বৎসরের বালক সতরঞ্চ-খেলার যে বিশেষ কিছু বুঝিত, তাহা নহে; তথাপি ঐতিহাসিক বা জীবন-চরিত লেখকগণ আধুনিক বীরের ভবিষ্য-জীবনের অনেক ছায়াপাত আবিষ্কার করেন। এই সকল সামান্য ঘটনার মূলে জনসাধারণ কিন্তু বুঝিত, সুরেশচন্দ্রের ন্যায় অশান্ত, অশিষ্ট, দুর্ব্বিনীত, দুষ্ট বালক বুঝি আর নাই! কিন্তু সুরেশচন্দ্রের মাতা এক দিনের জন্যও মনে করেন নাই, আমার সুরেশ প্রকৃত দুষ্ট বা অশিষ্ট। পুত্রের বিপদাশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্ক ছিলেন বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও সুরেশকে নিতান্ত দুষ্টস্বভাবের বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি যে অন্তর্য্যামিনী!

সতরঞ্চ-খেলা সম্বন্ধে আমাদিগের দেশে একটি কৌতূহলজনক কিংবদন্তী আছে। লঙ্কাধিপতি রাবণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, দেবলোক তাঁহার দুর্ব্বার বিক্রমে সন্ত্রস্ত; স্বয়ং চণ্ডীদেবী রক্ষঃপুরীর রক্ষয়িত্রী! এইরূপ দৈববলে বলী ও প্রচণ্ড পরাক্রমশালীর বিনা-যুদ্ধে অবস্থানে স্বতঃই চিত্তের অবসাদ ঘটে! বিনা সমরে রাবণ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতেন না—সর্ব্বদাই মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিতেন! পতিব্রতা বুদ্ধিমতী মন্দোদরী স্বামীর অন্তরের গতি বুঝিয়া স্থির করিলেন, এমন একটি উপায় উদ্ভাবনা করিতে হইবে, যাহাতে স্বামীর সমর-পিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। সেই চেষ্টার ফলেই সতরঞ্চ-ক্রীড়া! এই চতুরঙ্গসেনা-সমন্বিত সতরঞ্চ ক্রীড়ায় চিত্ত-বিনোদন আছে, কিন্তু অগণ্য পতিপুত্রহীনা রমণীর হৃদয়ভেদী রোদন-রোল নাই। রক্ষোরমণীর এই পরম হিতকর অনুষ্ঠান এক্ষণে কর্ম্মহীন বঙ্গবাসীর কর্ম্মসাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সে যাহা হউক, অল্পদিবসে গিরীশ বাবু কলিকাতার উপকণ্ঠ ভবানী-পুর, কড়েয়ায় একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসেন; সুরেশচন্দ্রকে কলিকাতার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন; কিন্তু মস্তিষ্ক-পরিচালনা অপেক্ষা শরীর-পরিচালনার দিকেই সুরেশচন্দ্রের

আন্তরিক অনুরাগ; কলিকাতায় অবস্থানকালে নানা লোকের নিকট বিবিধ বীরকাহিনী শুনিবারও বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছিল। অন্তরের অন্তরতম কক্ষে সেই সকল বীরবিক্রম অঙ্কিত হইতে লাগিল তখন ক্রীড়াস্থলে আপন সঙ্গিসেনা লইয়া সুরেশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে সমরাভিনয় করিতে লাগিলেন। বালকেরা দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া দুই দলে বিভক্ত হইত। বৃক্ষ বা কোন মৃত্তিকাস্তূপ তাহাদের দুর্গ হইত এবং সেই দুর্গাধিকার উপলক্ষে উভয় দলে সমরাভিনয় হইত। যেরূপ নেপোলিয়ন্ গোলার পরিবর্ত্তে বরফখণ্ড লইয়া বাল্যখেলা খেলিতেন, আমাদের সুরেশ-চন্দ্রও তদ্রূপ এখানকার অনায়াসলব্ধ মৃত্তিকার গোলায় সেই উদ্দেশ্যসাধন করিতেন।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## সর্প ও সুরেশ

এইবার আমরা যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সহস্রের মধ্যে একজনও এরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে কি না সন্দেহ! বিশেষতঃ সুরেশচন্দ্রের ন্যায় সেই একাদশ বৎসরমাত্র বয়সে এরূপ সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উদাহরণ নিতান্ত বিরল।

সুরেশ কলিকাতা হইতে স্বদেশে ফিরিয়াছেন। স্বদেশের মুক্ত-বায়ুতে বিমুক্ত হৃদয়ে অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা মিটাইতেছেন। নগরের নির্জ্জীবতা বা বিলাসিতা বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তিনি সেই বাল্যের সদা চঞ্চল, অসমসাহসী, অকুতোভয় নাথপুরের সুরেশচন্দ্রই

আছেন। একদিন পক্ষীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া একটি আম্রবৃক্ষের উপর কতকগুলি পক্ষীর বাসায় সুরেশচন্দ্রের দৃষ্টি পড়িল। আর বিলম্ব কেন? সুরেশচন্দ্র বৃক্ষে উঠিলেন। বৃক্ষে উঠিবেন, তাহাতে আবার সাবধানতা বা ভয় কি? একমাত্র পতনের আশঙ্কা,—সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ে তাহার স্থান নাই! এখন ত ১১ বৎসর বয়স হইয়াছে!

সুরেশচন্দ্র পক্ষি-নীড়ের নিকট হস্তপ্রসারণ করিবেন, এমন সময়ে অদূরে কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি বিকট শব্দ শুনিতে পাইলেন। শব্দানুসারে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বালক কেন, যুবকের হৃদয়ও কম্পিত ও ভীত হইয়া পড়ে। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড সর্প বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সর্প এক একবার ফুলিতেছে, আর স্থির-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। তাহার চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিতেছে। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, নামিবার উপায় নাই; নামিতে হইলে তাহার মুখ আতক্রম না করিয়া অবতরণ করিবার উপায় নাই। অন্য কেহ হইলে সেই অভাবনীয় বিষম বিপৎপাতে বিহ্বল বা মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। সুরেশচন্দ্র সে উপকরণে গঠিত নহেন। ক্ষণেকের মধ্যে তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। সে স্থান হইতে লম্ফপ্রদান করিলে জীবন সমধিক বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতে বাকি রহিল না। সুরেশচন্দ্র অবিলম্বে শাখান্তরে সর্প হইতে একটু দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু নামিবার উপায় নাই। এদিকে সর্পটি দেখিল, শীকার সরিয়া যায়; গর্জ্জন করিতে করিতে তীরবেগে সুরেশচন্দ্রের উপর আক্রমণ করিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; নিকটবর্ত্তী একটি প্রশাখায় তাহার প্রতিরোধ ঘটিল। নিমেষের মধ্যে সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন, জীবনরক্ষার অন্য উপায় নাই; ভয়বিহ্বল হইয়া প্রাণ হারাইলে কি হইবে! নিমেষের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া প্রথম লক্ষ্য

হইতে ফণা তুলিবার পূর্ব্বেই একাদশ বৎসরের বালক শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বামহস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে উহার ফণা ধরিল! বিপদ্ বুঝিয়া বলবুদ্ধিও যেন পরিবর্দ্ধিত হইল। সর্প তখন ফুলিতে ফুলিতে বজ্রপাশে বালকের হস্তবেষ্টন করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র তাহাতে ভীত বা কাতর নহেন। বিশেষতঃ সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সঙ্গে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি ছিল। নিমেষমধ্যে দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা ধরিয়া দন্ত দ্বারা উহা খুলিয়া ফেলিলেন। নিমেষমধ্যে সেই ছুরিকা আপনার দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির নিম্নে সর্পের গ্রীবাদেশে বসাইয়া দিলেন; মুহূর্ত্তমধ্যে উহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন! এইরূপে অসীম-সাহসে অতুল্য-কার্য্য তৎপরতায় একাদশ বৎসরের বালক আসন্ন-মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিল!

শত্রু-নিপাত হইল। সুরেশচন্দ্র এইবার আপনার অভীষ্ট-সাধনে অগ্রসর। এইরূপে আত্মরক্ষা করা অন্যের অসাধ্য এবং অন্য কেহ হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিত, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের তখন ভয়ের কারণ গিয়াছে, সুতরাং সঙ্কল্পসাধন কেনই বা অবশিষ্ট থাকে; তখন তিনি পক্ষিশাবক সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইটি সুন্দর পক্ষিশাবক সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই আপনার অপূর্ব্ব বিজয়-নিশান, রক্তাক্তদেহ, কর্ত্তিতমুণ্ড সেই সর্পটিকেও সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুরেশচন্দ্রের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-মণ্ডলী সেই বিজয়লব্ধ অপূর্ব্ব ধনসম্পত্তি দেখিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন, পরে আদ্যোপান্ত সমুদয় শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন! পিতামাতার প্রাণে তখন যেরূপ হর্ষবিষাদ ও বিস্ময়ের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা নির্জ্জীব লেখনীমুখের সাধ্যাতীত!

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## কুক্কুর ও সুরেশ

বঙ্গে অস্ত্র-আইনের কল্যাণে ভারতবাসী বা ভারত গবর্ণমেণ্টের যতদূর উপকার হউক আর নাই হউক, ইংরাজরাজ্যে শৃগালকুক্কুরাদির কিছু প্রতাপ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। এক একটি ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুর অন্ততঃ ১০।১২টি প্রাণি-সংহার না করিয়া মারা পড়ে না, এবং তাহার বিক্রমে কিয়ৎকাল গ্রামের লোক সদাই সশঙ্ক থাকে। এইরূপ বিপৎপাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রার্থনাও লজ্জার বিষয় এবং সাহায্য-প্রার্থনায় হয়ত অনেকে সাহসী হয় না এবং সাহায্য প্রার্থনা করিলেও স্থানবিশেষে প্রার্থনা-পূরণের পূর্ব্বেই কতকগুলি প্রাণীকে অকালে শৃগাল কুকুরের দংশনে জীবন হারাইতে হয়।

সুরেশচন্দ্র নাথপুরের বাটী গিয়াছেন। গ্রামে ক্ষিপ্ত কুকুরের ভয়ে লোকে সদাই শঙ্কিত, কখন্ কাহার ভাগ্যে কি দুর্ঘটনা ঘটে! তখন পাস্তূর-প্রণালী প্রচলিত হয় নাই এবং দরিদ্র নাথপুরবাসিগণের এরূপ অবস্থাও ছিল না যে, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্ম প্যারিস পর্য্যন্ত যাইয়া পাস্তূরের প্রস্তুত ঔষধাদি সেবন করে। সুতরাং ভগবানের নাম করিয়া সামান্য দেশীয় প্রলেপাদির উপরই নির্ভর করিতে হইত। সে যাহা হইক, শৃগালকুকুরের ভয়ে বাটী আসিয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকা সুরেশচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু বিষমভয়ে সঙ্গিসহচরগণও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত না। সুরেশচন্দ্রকে একাকী সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে যাইতে হইত। গ্রামের প্রান্তভাগের একটি পথ ধরিয়া

চলিতেছেন, এমন সময়ে একটি ক্ষিপ্ত-কুকুর তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিলেন। তিনি একাকী; হস্তে যষ্টি পর্য্যন্ত নাই; নিকটে লোকালয় নাই; এমন কি, বৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই। সুরেশচন্দ্র অগত্যা সেই পথ ধরিয়া ধূলি উড়াইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কুকুরও দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিল। মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, কুকুরটি জিহ্বা বাহির করিয়া লক্-লক্ করিতে করিতে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছে! তিনিও ছুটেন কুকুরও ক্রমশঃ তাঁহার অনুসরণে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। ছুটিতে ছুটিতে বালক ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আর দৌড়াইতে পারে না! এইবার কুকুরের মুখে পড়িতে হইবে; আর অব্যাহতি নাই! কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি সুরেশচন্দ্র সেই দারুণ বিপদ্‌কালেও ভয়বিহ্বল না হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। সুরেশচন্দ্র আর দৌড়াইতে পারিলেন না, কুকুরটী আসিয়া পড়িল; আর দুই চারিপদ মাত্র অগ্রসর হইয়া আসিলেই তীক্ষ্ণ দশন-নখরে বালকের সুকুমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে। সুরেশচন্দ্র কলিকাতা অবস্থানকালে "জোড়া পায়ে লাথি" অভ্যাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কিছুদিন কলিকাতায় উহার বড়ই প্রচলন হয়, বুঝি স্বনামখ্যাত জিতেন বন্দ্যো'ই তাহার বহুল প্রবর্ত্তক! সুরেশচন্দ্র সহসা দাঁড়াইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া পূর্ণশক্তিতে কুকুরটিকে জুতাশুদ্ধ "জোড়াপায়ের লাথি" মারিলেন। বিষম বেগে আসিতে আসিতে আকস্মিক প্রহারে কুকুরটি পথপার্শ্বস্থ নালায় গড়াইয়া পড়িল। সুরেশচন্দ্র ইত্যবসরে একখানি ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া কুকুরটি উঠিতে না উঠিতে উহার মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই অব্যর্থ সন্ধানেই কুকুরটিকে আর মাথা তুলিতে হইল না; পথ-পার্শ্বস্থ সেই নালায় গড়াইতে গড়াইতে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের দ্বারা নাথপুর গ্রামের সাময়িক শঙ্কা বিদূরিত

হইল। সেই সঙ্কটকালে ত্রয়োদশবর্ষমাত্র বয়সে যিনি নাথপুরের একটি বিষম আশঙ্কা বিদূরিত করেন, পরিণত বয়সে তাঁহার দ্বারা যে নাথপুরের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি!

---

# নবম পরিচ্ছেদ

## শীকার ও স্থরেশ

শীকারের ন্যায় প্রিয়-বিষয় ইংরাজের নিকট আর কিছুই নাই। শীকারে ইংরাজজাতি সময় সময় প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ইংরাজদের দেশে যেরূপ শীকার প্রচলিত, ভারতবর্ষে তাহা নাই, কারণ ভারতের সহিত ইংলণ্ডের অনেক পার্থক্য। ইংলণ্ডে যখনই শীকারের আয়োজন হয়, তখনই কতকগুলি কুকুরকে সেই দলের একটি প্রধান অঙ্গরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, শীকারিগণও সকলে তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হয়েন। কেবল পক্ষি-শীকারের সময় তাঁহারা অশ্ব বা কুক্কুর ব্যবহার না করিয়া সকলে কেবলমাত্র এক একটি বন্দুক সঙ্গে করিয়া শীকারে রওনা হয়েন। ভারতবর্ষে ইংরাজগণ শীকারে বহির্গত হইলে সাধারণতঃ হস্তিপৃষ্ঠে গভীর জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। সঙ্গে অসংখ্য লোক যায়, ইহারা জঙ্গলের একদিকে থাকিয়া বন্যজন্তুদিগকে তাড়াইতে থাকে; সাহেবেরা হস্তিপৃষ্ঠে এক একস্থানে দণ্ডায়মান থাকেন; বন্যজন্তুগণ তাড়া পাইয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিলে গুলী করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডে হিংস্রজন্তু এক্ষণে একবারে নাই; ভারতবর্ষের জঙ্গলসকল বরাহ, বন্যমহিষ,

নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও হস্তীতে পূর্ণ। এদেশে যেথানে বন্যপশু একেবারে নাই, কেবল সেথানেই ইংরাজগণ পদব্রজে শীকারে যাইয়া থাকেন। তবে দেশীয় শীকারিগণ হস্তী প্রভৃতি কোথায় পাইবে? তাহারা তীর-ধনুক বা বন্দুক লইয়া অবাধে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া থাকে; তাহাদের প্রাণে বন্যজন্তুর ভয় একেবারেই নাই! জঙ্গলই তাহাদের ঘরবাড়ী, জঙ্গলের পশুশীকারই তাহাদের জীবিকা। জলে স্থলে, দিবারাত্র, সর্ব্বদা তাহারা নানাপ্রকার বিপদে বেষ্টিত, কিন্তু তাহারা এ সকলের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। বন্যপশুচর্ম্ম, বনজাত নানাদ্রব্য, তাহারা গভীর বনে সংগ্রহ করিয়া নিকটস্থ সহরে আনিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে; সময় সময় কেহ কেহ বাঙ্গালীজাতিকে যে কাপুরুষ আখ্যা দিয়া থাকেন, সত্যই এই সকল লোককে কথনই সে আখ্যায় আখ্যায়িত করা যাইতে পারে না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে নীলকুঠী থাকায় অনেক ইংরাজ এই জেলায় বাস করিতেন। ইঁহারা প্রায়ই অশ্বপৃষ্ঠে বিস্তৃত ময়দানে ও কৃষকদিগের শস্যশূন্য ক্ষেত্রে বরাহ, শৃগাল প্রভৃতি শীকার করিবার জন্য স্বদেশের ন্যায় বহুসংখ্যক কুক্কুর সমভিব্যাহারে শীকারে আসিতেন। ইঁহাদের সকলের হস্তেই এক একটি বড় বড় বর্শা থাকিত; বরাহ বা শৃগাল ইঁহাদের কুক্কুর-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া দীর্ঘ ঘাস বা ক্ষুদ্র ঝোপ হইতে নির্গত হইলে ইঁহারা বর্শাহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকেন। সুবিধা পাইলেই কেহ না কেহ বর্শাদ্বারা হতভাগ্য বরাহকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিতেন। এরূপ শীকার এখনও ইংরাজগণ সময় সময় করিয়া থাকেন। এদেশ হইতে বহুদূরে বিদেশে ভিন্নজাতিদিগের মধ্যে নির্ব্বাসিতরূপে বাস করিয়া ইঁহারা সময় সময় এইরূপ শীকারে কালযাপন করিয়া কতকটা নির্ব্বাসনের ক্লেশ অপনোদন করিয়া থাকেন।

যখন সুরেশ নাথপুরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তিনজন সাহেব গ্রামের নিকট অশ্বারোহণে শীকারে আসিলেন, সঙ্গে অসংখ্য কুক্কুর। উঁহারা একটা অতি হিংস্র বৃহৎ বন্য বরাহের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন। বরাহ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতেছে; শীকারিগণ কোনমতেই তাহাকে বর্শাবিদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। প্রায় সন্ধ্যা হয়, শীকারিগণ হতাশ হইয়া অন্ধকার জন্য শীকার পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদের দৃষ্টি নিকটস্থ বাঁশঝোপের মধ্যে বরাহের প্রতি পতিত হইল। অমনি বন্দুকের আওয়াজে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; কুকুরগণ ডাকিয়া উঠিল; চারিদিকে যেন এক ঘোর আলোড়ন উপস্থিত হইল; কিন্তু বরাহ আহত হইল না, তবে বন্দুকের শব্দে সে ভীত হইয়া বাঁশঝোপ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল। সম্মুখে বিস্তৃত মাঠ; ভীত ও বিপন্ন বরাহ এক্ষণে সেই মাঠ দিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিল; শীকারিগণও সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলেন; বরাহের পশ্চাতে কুকুরগণ মহাচীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইল। যে দিকে বরাহ ছুটিয়াছে, সেই দিক্ হইতে এমন সময়ে তিনটি বালক গ্রামের দিকে আসিতেছিল; ইহাদের একটি সুরেশ। বালকগণ মাছ ধরিতে গ্রাম হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়াছিল, এক্ষণে ছিপ-স্কন্ধে গৃহে ফিরিতেছিল। হঠাৎ নিকটে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বালকগণ বালসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। সাহেবেরা তাহাদিগকে দেখিলেন, ক্রোধান্ধ বরাহ যে এখনই তাহাদের খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন। তাঁহারা হস্ত নাড়িয়া, চীৎকার করিয়া, তাহাদিগকে পলাইতে বলিতে লাগিলেন; কিন্তু বালকগণ, তাঁহারা কি বলিতেছেন বুঝিতে পারিল না। প্রথমে বরাহের প্রতি সুরেশেরই দৃষ্টি পড়িল। তিনি তখন তাঁহাদের বিপদ্ বুঝিলেন, কিন্তু ভয় কখনও

সুরেশের হৃদয়ে স্থান পাইত না। এক্ষণে উন্মত্ত বরাহ দেখিয়া ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, সুরেশের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইল। তিনি যে বরাহ-শীকার দেখিতে পাইবেন, ইহা ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন; তিনি পলাইলেন না, তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই, তবে তিনি সঙ্গিদ্বয়কে পলাইতে বলিয়া নিজে ছিপহস্তে বরাহের দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিতে দেখিতে মুখে গ্যাঁজলা তুলিতে তুলিতে, ভীষণ শব্দ করিতে করিতে, বরাহ সুরেশের নিকটস্থ হইল। বরাহের পশ্চাতেই কুকুরগণ, তৎপশ্চাতেই সাহেবগণ বন্দুকহস্তে প্রস্তুত। তাঁহারা তখনও সুরেশকে পলাইতে চীৎকার করিয়া অনুরোধ করিতেছেন; পাছে গুলী সুরেশের গায়ে লাগে; এই ভয়ে তাঁহারা বন্দুক ছুড়িতে পারিতেছেন না; অথচ বালককে রক্ষা করিবারও আর উপায় নাই। বরাহ আসিয়া সুরেশের উপর পড়িল; তাহার মুখ হইতে নির্গত গ্যাঁজলায় সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত হইল; তাহার চক্ষু হইতে বালকের প্রতি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল! সে তাহার প্রখর দন্তে বালকের দেহ খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য মস্তক অবনত করিল; আর এক মূহূর্ত্ত। সেই মূহূর্ত্তে কেবল একজনের নহে, শতসহস্র লোকের অদৃষ্ট-লেখন স্থির হইয়া গেল। এই বালকের মৃত্যু বা জীবনের সহিত সহস্র লোকের জীবন সংশ্লিষ্ট ছিল। সুরেশও সেই সময়ে বুঝিলেন যে, আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার জীবন-নাট্যের শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ টলিল না! তিনি ভীত হইলেন না, বরং হৃদয়ে একরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন!

পর মূহূর্ত্তে সুরেশ হস্তস্থ বংশনির্ম্মিত ছিপ দ্বারা বরাহের মস্তকে সবলে আঘাত করিলেন; বরাহ সেই গুরুতর আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া উল্টাইয়া পড়িল! সে পুনরায় উঠিবার পূর্ব্বেই কুকুরগণ আসিয়া

তাহাকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া দংশনে দংশনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল! একদিকে কুকুরকে আক্রমণ করিতে গেলে, আর তিনদিক্ হইতে কুকুরগণ তাহাকে দংশন করিতে থাকে। এ দিকে সুরেশও ছিপদ্বারা বৃষ্টিধারার ন্যায় ক্রমাগত বরাহকে প্রহার করিতেছেন,—বরাহ প্রকৃতই নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে; পলাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সে কোনমতে পলাইতে পারিতেছে না! এদিকে সাহেবেরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে গুলী চালাইবার আর উপায় নাই,—বন্দুক ছুড়িলে কুকুরের গায়ে লাগে। বরাহের অঙ্গের এমন স্থান নাই, যেথানে একটা না একটা কুকুর কামড়াইয়া না আছে; কাজেই সাহেবগণ বন্দুকের অপর পৃষ্ঠ দিয়া বরাহকে ক্রমাগত প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রহারে অনতি-বিলম্বে বরাহ পঞ্চত্ব লাভ করিল!

বরাহ-বধ হইলে সাহেবেরা এই বীর বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ বালক এপর্য্যন্ত দেখেন নাই;—তাঁহারা বালকের সাহসে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন,—তাঁহারা সুরেশকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় তাঁহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সুরেশের সঙ্গিগণ পলাইয়াছে, তাহাদের সঙ্গীর কি হইল, তাহা তাহারা দেখে নাই,—সুরেশ যেমন তাহাদিগকে পলাইতে বলিয়াছিলেন, তাহারা তেমনই পলাইয়াছিল, এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করে নাই। রাত্রি হইয়াছে, চারিদিক্ অন্ধকারে ঘেরিয়াছে, পাড়াগাঁয়ের মাঠ,—রাস্তা নাই,—এরূপ অবস্থায় গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছান সহজ নহে। সাহেবেরা সুরেশকে তাঁহাদের সঙ্গে কুঠিতে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সুরেশ নাম ধাম বলিলে, একজন সাহেব তাহা নিজ নোটবুকে লিখিয়া লইলেন। নিজেরা সাহসী,' ইংরাজজাতির ন্যায় সাহসের আদর

করিতে আর কেহ পারে না। যাহাতে বীরত্ব, যাহাতে তেজ, যাহাতে সৎসাহস,—ইংরাজগণ তাহাকেই প্রাণের সহিত ভালবাসেন, মান্যভক্তি করেন,—স্বভাবতঃই তাঁহাদের প্রাণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা, নীচতা, হীনতা, দুর্ব্বলতা, তোষামোদকারিতা প্রভৃতিকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন; ভারতবাসীকে যে তাঁহারা ঘৃণা করেন, তাহার অন্যতম কারণ—ভারতবাসী সাধারণতঃ হীন, নীচ, দুর্ব্বল তোষামোদকারী।

যেখানে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেখান হইতে নাথপুর প্রায় এক ক্রোশ। অন্ধকার হইয়াছে, সুরেশ শীকারিগণকে পরিত্যাগ করিয়া যত শীঘ্র হয় গ্রামাভিমুখে গমনের চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু সাহেবেরা কিছুতেই ছাড়েন না। একজন বলিলেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে কুঠীতে চল। আজ রাত্রে সেখানে থাকিয়া কা'ল সকালে বাড়ী আসিও।"

সুরেশ উত্তর করিলেন, "আমার মা ও খুড়ো মশায় কি ভাবিবেন? আমি রাত্রে বাড়ী না ফিরিলে তাঁহারা পাগল হইবেন।"

সাহেব। সে জন্য কোন চিন্তা নাই। তাঁহারা যাহাতে খবর পান, তাহা আমরা করিব। তোমার আত্মীয়েরা যাহাতে ভাবিত না হন, সে বিষয়ে আমরা দৃষ্টি রাখিব।

সুরেশ। আমার ক্ষুধা পাইয়াছে। আপনাদের বাড়ী খেলে আমার জাত যাবে।

সাহেবেরা হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "বালক, তোমার জাতের এত ভাবনা? জাতের বিষয় তুমি কি জান?"

সুরেশ উত্তর করিলেন, "বোধ হয় জাতের বিষয় বেশী কিছু আমি বুঝি না, তবে সাহেবের বাড়ী খেলে যে জাত যায়, তাহা আমি জানি।"

সাহেব। তুমি এই নাথপুরেই সব সময় বাস কর?

সুরেশ। না, আমি সচরাচর কলিকাতায় বাস করি; আমি ভবানীপুরের লণ্ডন্ মিশন্ কলেজে পড়ি।

সাহেব। ওঃ, তবে ত তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান্! খ্রীষ্টান্দের সঙ্গে যাহারা মিশে, তাহারা খ্রীষ্টান্ না হ'লেও পিরিলি হয়।

সুরেশ। আমি তা স্বীকার করি না। আমি খ্রীষ্টানের ছোঁয়া জল খাই না, এমন কি, পানও খাই না।

সাহেব। তুমি তাহাদের সঙ্গে এক সঙ্গে উঠা-বসা কর, তুমি তাহাদের ছুঁয়ে থাক, তার পর না স্নান করেই জল খাও। স্কুলে তুমি কখন ত স্নান কর্ত্তে পার না।

এ কথার জবাব সুরেশ করিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবদের সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিলেন। ঠিক এমন সময়ে সেই দিকে অনেক আলো আসিতেছে দেখা গেল। সুরেশের সঙ্গীদিগের নিকট তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ আলো লইয়া সুরেশকে খুঁজিতে সেই দিকে আসিতেছিলেন। অপর দিক্ হইতে সাহেবদিগের চাকর ও লোকজনেরাও আলো লইয়া সাহেবদিগকে খুঁজিতে আসিতেছিল; কাজেই সুরেশের কুঠীতে যাওয়া হইল না, তবে তিনি পরদিনই যাইবেন স্বীকার করায় সাহেবেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কুঠী চলিয়া গেলেন।

---

# দশম পরিচ্ছেদ

## মেমসাহেব ও সুরেশ

বরাহ-শীকার ঘটনা সুরেশের জীবনের একটি শুভ-ব্যাপার; কারণ, সেদিন হইতে সুরেশ নাথপুরের নিকটস্থ ইংরাজ সমাজে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হইলেন। সে সময় ইংরাজগণ যে দেশীয়দিগের সহিত মেশামেশি

করিতে ইচ্ছা করিতেন না, এরূপ নহে; বরং দেশীয়গণই ইংরাজদিগের সহিত মেশামিশি করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইতেন। তখন হিন্দুয়ানীর প্রতাপ এখন অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল, সুতরাং বিদেশীয় সাহেবদিগের প্রতি লোকের কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল। তখনকার নীলকুঠিয়াল সাহেবগণ তাঁহাদের নিজের কাজ ও ব্যবসায়ের জন্য দেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া দেশীয়দিগের সামাজিক আচারব্যবহার সকল বিশিষ্টরূপে বিদিত হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা কখনও দেশীয়গণের সহিত মেশামিশি করিতে পারিতেন না। উভয়ের মধ্যে বিশেষ দূরত্বভাব বিরাজ করিত।

বরাহ-শীকার-দিবস হইতে সুরেশ প্রায় মধ্যে মধ্যে নাথপুরের নিকটস্থ নীলকুঠীতে গমনাগমন করিতেন। সাহেব-মেমগণ সকলেই তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন; কুঠীর দেশীয় কর্ম্মচারিগণেরও তিনি বড় প্রিয় হইলেন। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ যত্ন-আদর-অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সরলভাব, তাহার নির্ভীকতা, নীচ ও হীন বিষয়-মাত্রেই তাঁর ঘৃণা,—পরোপকারে সর্ব্বদাই তাঁহার তৎপরতা, এই সকল গুণে সুরেশ দেখিতে দেখিতে নীলকুঠীর সকলেরই একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি একদিন কুঠীতে না আসিলে সাহেব-মেমগণ সকলেই কেবল যে দুঃখিত হইতেন, এমন নহে, সকলেই তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইতেন।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে নীলকুঠীর সাহেবেরা প্রায়ই মেম লইয়া বাস করিতেন না। মেমেরা দূর ইংলণ্ডে স্বামিবিহনে বিরহ-দুঃখে কালাতিপাত করিতেন; সাহেবগণ সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বঙ্গদেশের গ্রামে দেশীয় কৃষকবেষ্টিত হইয়া নীলের চাষ করিতেন; সে সময়ে বিলাত হইতে মেম আনিবার সুবিধা ছিল না; আনিলেও রাখিবার সুবিধা হইত না। এই জন্য আমরা যে

সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এ দেশে নীলকুঠীতে মেম প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না।

তবে নাথপুরের কুঠীর সাহেবের মেম এ দেশে ছিলেন; তিনি বালক সুরেশকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে সুরেশকে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিলেন; কারণ, তাঁহার নিজের পুত্রও ঠিক সুরেশের একবয়সী ছিলেন। তাঁহার সে পুত্রকে তিনি নিকটে রাখিতে পারেন নাই; সে বালক সুদূর বিলাতে লেখাপড়া করিতেছিলেন। সুরেশের ইংরাজ-প্রকৃতি-সুলভ অনেক গুণ দেখিয়া মেমসাহেব তাঁহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। সুরেশও বড় আনন্দে ও সুখে নাথপুরে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সাহেব ও মেমসাহেবের নিকট সদাসর্ব্বদা থাকিয়া সুরেশ বেশ ইংরাজী বলিতে শিখিলেন; যদিও তাঁহার এখনও ইংরাজীভাষায় বিশেষ দখল জন্মে নাই, তবুও বোধ হয়, সুরেশ যেরূপ সে সময়ে ইংরাজী বলিতেন, সুরেশের সমবয়সী বাঙ্গালীর ছেলে কেহ তেমন ইংরাজী বলিতে পারিতেন না।

একদিন বৈকালে সুরেশ মেমসাহেবের সহিত একখানা টম্‌টম্ গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে বহির্গত হইলেন। মেমসাহেব প্রায়ই সুরেশকে সঙ্গে লইয়া এইরূপ বেড়াইতে যাইতেন। বিস্তৃত নীলক্ষেতের মধ্য দিয়া বাঁধা-রাস্তা, মেমসাহেব এই রাস্তার উপর দিয়া গাড়ী করিয়া বেড়াইতেন; সুরেশ প্রায়ই সঙ্গে থাকিতেন। মেমসাহেব তাঁহাকে নানা জ্ঞানোপদেশ দিতে থাকিতেন; সুরেশ মেমসাহেবকে এ দেশের নানা গাছ, লতা, পাখীর নাম ও তাহাদের সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেন। এইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা এক এক দিন এক এক দিকে বেড়াইতে যাইতেন। আজ মেমসাহেবের গাড়ী একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে বোধ হয়, কোন সদাশয়

ধনাঢ্য ব্যক্তি গ্রামের লোকের জলকষ্ট-নিবারণের জন্য এই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন; এক্ষণে অযত্নে ইহার আর পূর্ব্ব-শোভা নাই, জলও আর বড় পরিষ্কার নাই; পুষ্করিণী প্রায় শৈবাল ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে; তবে ইহার বক্ষ অতি সুন্দর ও অতি বৃহৎ পদ্মরাজিতে পূর্ণ। বোধ হয়, এমন মনোমুগ্ধকর পদ্ম আর কোন পুষ্করিণীতে কখনও ফুটিত না।

প্রায় সন্ধ্যা হয়। অস্তমিত সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ মেমসাহেবের মুখে পতিত হইয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব করিয়াছে। সেই সূর্য্যের কিরণ বৃক্ষপত্রে পতিত হইয়া চারিদিক্ সুবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। পাখীগুলি ডালে ডালে বসিয়া সন্ধ্যা-সমাগমে প্রাণমন খুলিয়া গান ধরিয়াছে; দূরে কৃষকগণ স্ব স্ব গোপাল লইয়া গায়িতে গায়িতে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। সন্ধ্যায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মেমসাহেব বিমুগ্ধ ও উৎফুল্ল হইয়া গাড়ী হইতে সেই পুষ্করিণীর তীরে হরিদ্বর্ণ নবদূর্ব্বাদল উপরে ধীরে ধীরে পদচারণ করিতে লাগিলেন,—সুরেশও তাঁহার পাশে পাশে চলিলেন। সুন্দর অপূর্ব্ব স্থান,—পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে রসাল অমৃত-বৃক্ষসকল সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে; এই সকল আম্রবৃক্ষের ঘন-পাতায় অস্তমিত সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া বৃক্ষগুলিকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। সম্মুখে বিস্তৃত সরোবর পদ্মে পরিপূর্ণ; ছোট বড় নানা রঙ্গের নানা পদ্ম সমস্ত পুষ্করিণীটির হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফুটিয়া আছে। চিরকালই ইংরাজমহিলা ফুলের বড়ই প্রয়াসিনী; ফুল দেখিলে, ফুল পাইলে মেমগণ হৃদয়ে যত আনন্দ উপলব্ধি করেন, হীরা-মুক্তা-জহরত পাইলে তত হন না। মেমসাহেব কতকগুলি পদ্ম সংগ্রহ করিবার জন্য মনে মনে বড়ই ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কে এ সময়ে পুষ্করিণীতে নামিয়া পদ্ম আনিবে? সঙ্গে সহিস পর্য্যন্ত নাই, নিকটে কোন লোককে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি পদ্মলাভে হতাশ হইলেন,

মনের বাসনা মনে মনে শমিত করিলেন, সুরেশকে কিছু বলিলেন না ; সুরেশ বালক, তাঁহার অভিপ্রায় জানিলেও সে কি করিতে পারে ?

কিন্তু বালক মেমসাহেবের হৃদয়ের অভিলাষ বুঝিল। সে বুঝিল, মেমসাহেব কয়েকটি পদ্ম পাইলে বড়ই প্রীতা হইবেন। যিনি তাঁহার জন্য এত করিয়া থাকেন, যিনি তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসেন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না ?—ইহা কখনই হইতে পারে না। বাল্যকাল হইতেই সুরেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একবার তাঁহার মনে কোন ইচ্ছা আসিলে তিনি তাহা কার্য্যে সম্পন্ন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। সুরেশ তৎক্ষণাৎ নিজ জামা ও জুতা খুলিলেন। মেমসাহেব তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলেন। এ সময়ে এরূপ পুষ্করিণীতে নামিলে বিপদাশঙ্কা আছে ভাবিয়া মেমসাহেব সুরেশকে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সুরেশ কোন কাজ করিতে একবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারিত না। সহস্র বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও সুরেশ তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সুরেশ মেমসাহেবকে ভীত বা চিন্তিত হইতে নিষেধ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পুষ্করিণীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি জল ঠেলিয়া, যেখানে পদ্ম ফুটিয়া ছিল, সেই দিকে চলিলেন। পুষ্করিণীতে অধিক জল ছিল না, কাজেই সুরেশ সাঁতার দিয়া যাইতে পারিলেন না, হাঁটিয়া চলিলেন।

কিন্তু সুরেশ পদ্ম আনয়ন করা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, তত সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইল না। সুরেশ কিছু দূর গিয়াই আর সহজে অগ্রসর হইতে পারিলেন না,—বোধ হইল যেন, তিনি ক্রমে ডুবিবার উপক্রম করিতেছেন, কি যেন তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতেছে। মেমসাহেব ভীত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ,

অনুনয়, অবশেষে আজ্ঞা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সুরেশ ফিরিলেন না;—কষ্টে,—বহু কষ্টে, তিনি পদ্মের নিকট পৌছিলেন ও কতকগুলি পদ্ম সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু তৎপরেই তিনি ফিরিবার জন্য বিষম চেষ্টা করিয়াও ফিরিতে পারিলেন না, ক্রমে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন মেমসাহেব ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন! তাঁহার চীৎকারে একজন কৃষক ছুটিয়া আসিল, সে আসিয়াই সুরেশের বিপদ্ বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া আরও জনকয়েককে ডাকিল। তখন তাহারা অনতিবিলম্বে একগাছা দড়ি সংগ্রহ করিয়া সুরেশের দিকে ফেলিয়া দিল; সুরেশও তৎক্ষণাৎ সেই দড়ি ধরিয়া নিজ কোমরে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তখন কৃষকগণ সকলে তাঁহাকে টানিয়া তীরে উঠাইল। দেখা গেল সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ পঙ্কে আবৃত হইয়া গিয়াছে। বহুবৎসর ধরিয়া এই পুষ্করিণীতে কর্দ্দম জমিতেছিল। ক্রমে এত পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহ আর সাহস করিয়া ইহাতে নামিত না। নামিলে দেখিতে দেখিতে সে কর্দ্দমে বসিয়া যাইত, আর উঠিবার তাহার সাধ্য থাকিত না। কৃষকগণ না আসিলে সুরেশেরও আজ ঠিক এই অবস্থা হইত! তাঁহার প্রাণরক্ষার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু মৃত্যুমুখে পড়িয়াও সুরেশ পদ্ম ছাড়েন নাই! তিনি যখন পদ্মসহ তীরে উঠিলেন, তখন তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

মেমসাহেব অনতিবিলম্বে সুরেশকে গাড়ীতে তুলিয়া কুঠীতে আনিলেন। সেখানে তাঁহার দেহ হইতে কর্দ্দম ধৌত করিয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহাকে ঔষধ প্রদান করা হইল। শীঘ্রই সুরেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপদের কথা সকলে শুনিল; সাহেবরা অতিশয় প্রীত হইলেন। যত দিন পদ্মটি শুকাইয়া ঝরিয়া না পড়িয়া গিয়াছিল, ততদিন মেমসাহেব সেটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন।

যে কয়মাস স্থরেশ নাথপুরে ছিলেন, সে কয়মাস তাঁহার বড়ই স্থখে কাটিয়া গিয়াছিল। এখানে পিতার তিরস্কার ছিল না, পড়াশুনার বড় হাঙ্গামা ছিল না, বিশেষতঃ সাহেব-মেমেরা বড়ই আদর-যত্ন করিতেন। দিনরাত তিনি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত খেলা করিতেন, শীকারে যাইতেন। সাহেবদের সঙ্গে একত্র আহার না করিলেও তিনি অনেক দিন কুঠীতে আহারাদি করিয়াছিলেন; পূর্ব্বভাব তাঁহার ক্রমে দূর হইতেছিল।

অবশেষে স্থরেশ নাথপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বালিগঞ্জে আসিলেন। মেমসাহেব এবং অন্যান্য সকলে অতিশয় দুঃখের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। মেমসাহেব শীঘ্রই বিলাত যাইবেন, তিনি স্থরেশকে সঙ্গে লইবার জন্যে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থরেশ কিছুতেই যাইতে সম্মত হইলেন না। যদি তিনি সে সময়ে তাঁহাদের সহিত যাইতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তিনি ইয়োরোপে গিয়া যে ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও বিপদে পড়িয়াছিলেন, সে সকল হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। তাহা হইলে তিনি অন্যভাবে শিক্ষিত হইয়া অন্যরূপ হইতেন। কোন্ সময়ে মানুষের অদৃষ্টচক্র কোন্ দিকে ঘুরে, তাহা কে বলিতে পারে? মেমসাহেব যে দিন স্থরেশকে বিদায় দেন, সেদিন তিনিও ভাবেন নাই যে, তাঁহারা ভিন্নভাবে ভিন্ন অবস্থায় তাঁহাদের স্থরেশকে আবার একদিন দেখিতে পাইবেন। সাহেব ও মেমসাহেব উভয়েই যাহাতে স্থরেশের উপকার বা সাহায্য হয়, এরূপ কিছু করিতে চাহিলেন;—কিন্তু স্থরেশ পরের উপকারপ্রার্থী নহেন, তিনি সাহেব ও মেমের নিকট বিদায় লইয়া বালিগঞ্জে আগমন করিলেন।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### গঙ্গাবক্ষে সুরেশ

সুরেশ নৌকারোহণ ও দাঁড় টানিতে ভালবাসিতেন। নাথপুর ইচ্ছামতীর তীরে অবস্থিত,—ইচ্ছামতী বাঙ্গলাদেশের একটি সুন্দর নদী—যেখানে নদী আছে, সেখানে জেলে আছে, এবং যেখানে জেলে আছে, সেখানে জেলেডিঙ্গিও আছে। সুরেশ তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই সকল জেলেডিঙ্গি চড়িয়া ইচ্ছামতীর স্বচ্ছবক্ষে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে বহুদূর চলিয়া যাইতেন। এরূপ নৌকাবিহারে সর্ব্বদাই বিপদের আশঙ্কা আছে,—বিশেষতঃ বালকগণের পক্ষে এরূপ নৌকারোহণে জলমগ্ন হওয়ার কোনই বিচিত্রতা নাই; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, নাথপুরে থাকিয়া সুরেশ বা তদনুসঙ্গিগণের কোনই বিপদ্ ঘটে নাই।

বালিগঞ্জে আর নৌকা চড়িতে না পারিয়া সুরেশের হৃদয় বড়ই বিষণ্ণ হইল। যেখানে বাস করিতেন, সেখান হইতে গঙ্গা বহু দূরে; সেখান হইতে গঙ্গায় গিয়া নৌকা-চড়া বা দাঁড়টানা সহজ কার্য্য নহে, তবে সুরেশ কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার পিতা এরূপ ধনী নহেন, যে তাঁহাকে একখানা নৌকা কিনিয়া দেন; সহরের দাঁড়ীমাঝী এরূপ নহে যে, কেবল কথায় তাঁহাকে নৌকা চড়িতে দিবে। যাহা হউক, তিনি অতি আয়াসে অবশেষে একটি "রোয়িং-ক্লব" স্থাপনা করিলেন। কোন গতিকে একখানা নৌকাও সংগ্রহ হইল। তিনি তাঁহার সমবয়স্ক পল্লীস্থ অন্যান্য

বালকগণকে লইয়া প্রত্যহ বৈকালে গঙ্গায় নৌবিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

এপ্রেল মাসের এক দিন আর চারিটি সমবয়স্ক বালক সমভিব্যাহারে সুরেশ নৌকা খুলিয়া গঙ্গাবক্ষে দাঁড় টানিয়া চলিলেন। মেটেবুরুজের নিকট নৌকা পৌছিলে আকাশে একটু কাল মেঘ দেখা দিল, কিন্তু আকাশ তখনও বেশ পরিষ্কার, ঝড়বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ;—রৌদ্র তখনও খুব প্রখর, বাতাস একেবারে নাই,—গরমও অসহ্য হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে সেই ক্ষুদ্র কাল মেঘ দেখিতে দেখিতে বড় হইল,—সূর্য্য ঢাকিয়া ফেলিল, আকাশ ঘন মেঘে পূর্ণ হইয়া গেল—দেখিতে দেখিতে বাতাস প্রবল হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে গঙ্গাবক্ষে ঘোর রোলে প্রবল ঝটিকা উঠিল। বোধ হইল যেন, ইন্দ্র-বরুণ-বায়ু প্রভৃতির মধ্যে সহসা গৃহবিবাদ ঘটিয়া সকলে সকলের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ধাবিত হইলেন। সুরেশের ক্ষুদ্র নৌকা এই প্রলয়ে পড়িয়া যায় যায় হইল!

সুরেশ ও তাঁহার সঙ্গিগণের কেহই আকাশের ভাবগতিক কখন্ কিরূপ থাকে, তাহা জানিতেন না। এপ্রেল ও মে মাসে বাঙ্গালাদেশে কিরূপ সহসা ঝড় উঠে,—কিরূপে সামান্য মেঘ আকাশের কোলে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে ভয়াবহ ঝটিকায় পরিণত হয়, সুরেশ বা তাঁহার সঙ্গিগণ এ বিষয় একবারও চিন্তা করেন নাই। এক্ষণে সহসা গঙ্গাবক্ষে এই ঝড় উঠায় তাঁহারা মহা বিপন্ন হইলেন। অতি কষ্টে নৌকাকে জলমগ্ন হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য কি যে, এই ভয়াবহ ঝটিকায় নৌকা রক্ষা করেন; দেখিতে দেখিতে হাল ভাঙ্গিয়া গেল, তখন নৌকা লাটিমের ন্যায় তীরবেগে গঙ্গাবক্ষে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, বালকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কোন মতে নৌকাকে স্থির রাখিতে পারিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে

একটি "বয়ায়" লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। সুরেশ ও তাঁহার সঙ্গিগণ সকলেই সঙ্গে সঙ্গে জলমগ্ন হইলেন!

সৌভাগ্যের বিষয়, সকলেই সন্তরণে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহারা ভাসিয়া উঠিয়া প্রাণপণে সন্তরণ দিয়া তীরাভিমুখে যাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু একে প্রবল স্রোত, তাহার উপর ঝড়বৃষ্টি, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ,—বালকগণের রক্ষা পাইবার কোন আশাই নাই। এই সময়ে সেই ঝটিকায় একখানি ষ্টীমার সেইখান দিয়া যাইতেছিল,—ষ্টীমারের লোকেরা বালকদিগের অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ষ্টীমার থামাইয়া অতি কষ্টে সুরেশের সঙ্গীদিগের তিন জনকে ষ্টীমারে তুলিয়া লইলেন;—সুরেশ ও তাঁহার অপর সঙ্গী স্রোতোবেগে এত দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, ষ্টীমারের লোকেরা তাঁহাদের দেখিতে পাইলেন না। সুরেশ ও তাঁহার সঙ্গী ভাসিয়া চলিলেন।

সঙ্গীকে ক্লান্ত দেখিয়া সুরেশ আপনার বিপদ্ ভুলিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কোনগতিকে প্রাণ বাঁচাইয়া ভাসিয়া চলিলেন; —কিন্তু সেই ঝটিকাবেগে তাঁহারা উভয়ে বহুক্ষণ একত্র থাকিতে পারিলেন না;—সুরেশ ও তাঁহার সঙ্গী ঝটিকাবেগে দুই জন দুই দিকে গিয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গী ক্লান্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে জলমগ্ন হইলেন! তিনিও ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন;—কিন্তু অতি কষ্টে তিনি নিজেকে কেবল জলের উপর ভাসাইয়া রাখিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

তিনি একখানি জার্ম্মাণ জাহাজের পাশ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই জাহাজস্থ একজন নাবিক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বিপদ্ বুঝিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একগাছা দড়ি তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিলেন;—সুরেশ দড়িটি দেখিতে পাইলেন ও তৎক্ষণাৎ অনেক কষ্টে দড়িটি ধরিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্তই ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছিলেন ;—দড়ি বাহিয়া জাহাজে উঠিতে গিয়া আবার জলে পতিত হইলেন। জাহাজের কাপ্তেন তাঁহাকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া অনতিবিলম্বে জাহাজের "জালিবোট" নামাইয়া দিলেন ;—ততক্ষণে সুরেশ আরও বহু দূরে ভাসিয়া গিয়াছিলেন ;—বহু কষ্টে নৌকাস্থ নাবিকগণ তাঁহাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় টানিয়া তুলিল। তিনি যখন জাহাজে নীত হইলেন, তখন তাঁহার একবারেই সংজ্ঞা ছিল না। জাহাজের ডাক্তারের বিশেষ যত্নে নানারূপ চিকিৎসায় পরদিবস সুরেশের সংজ্ঞা হইল ;—তখন জাহাজস্থ কাপ্তেন একখানি গাড়ী আনিয়া লোক সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার জনকজননী বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিরূপ আসন্নমৃত্যু হইতে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, শুনিয়া তাঁহারা হর্ষবিষাদে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে সুরেশ পদে পদে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছিলেন ;—যেন পদে পদে ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। দূর ব্রেজিলে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিবার জন্যই যেন তিনি প্রতি পদে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

---

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## ফিরিঙ্গি ও সুরেশ

সুরেশ প্রায়ই সঙ্গীদিগের সহিত বৈকালে ময়দানে ইডেন্ গার্ডেন, ঘোড়দৌড়ের স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। এরূপ সময়ে প্রায়ই তাঁহাদের ইংরাজ-বালকদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইত। একদিন

ময়দানে তাঁহাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ দুইটি ফিরিঙ্গি বালক তাঁহাদিগকে নিগার” প্রভৃতি বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছিল, এমন কি শেষ তাহাদের “শূয়ার” পর্য্যন্ত বলিতেও ছাড়িল না। সুরেশের আর সহ্য হইল না, তিনিও ফিরিঙ্গি-দ্বয়কে যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া গালি দিলেন,—ফিরিঙ্গি-দ্বয় সুরেশ কি ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা জানিত না, তাঁহাকে ঘুসি মারিতে উদ্যত হইল, সুরেশ তখন আত্মরক্ষা করিয়া ঘুসির প্রত্যুত্তরে তাহাদের একজনের নাসিকায় এমনই ঘুসি মারিলেন যে সে ঘুরিয়া পড়িল। তখন সেই দুইজন ফিরিঙ্গি একাকী সুরেশকে আক্রমণ করিল; ঘুসির উপর ঘুসি চলিতে লাগিল। শীঘ্রই ফিরিঙ্গিদ্বয় বুঝিল যে সুরেশ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাহাদের অপেক্ষা হীনবল নহে; এখন আর হটিবার উপায় নাই। তাহারা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সুরেশ এমনই ঘুসি-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে শীঘ্রই ফিরিঙ্গিদ্বয় মৃতবৎ ভূমিসাৎ হইল। সুরেশ নীচমনা ছিলেন না,—তিনি তাহাদের উভয়কে তখন সযত্নে তুলিয়া উহাদের সহিত মিষ্ট কথা কহিয়া “সেক্‌হ্যাণ্ড্” করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### উচ্ছৃঙ্খল সুরেশ

সুরেশ “লণ্ডন্-মিশন্” স্কুলের যে ভাল ছেলে ছিলেন, তাহা বলা যায় না। পড়া-শুনা করা অপেক্ষা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে পারিলে তিনি অধিক সুখী হইতেন। মাষ্টারগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক

রহিতেন। সুবিধা পাইলেই সুরেশ মাষ্টার মহাশয়দিগকে নানাপ্রকারে জ্বালাতন করিতেন। স্কুলের যত দাঙ্গাবাজ ছেলের সুরেশ দলপতি; কেবল যে স্কুলের লোক তাঁহাদের ভয় করিত, এরূপ নহে, স্কুলের নিকটস্থ দোকানদার ও অন্য লোকজনও তাঁদের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। সুরেশ প্রত্যহ ৯।৵ •টার সময় নিয়মিতরূপ বাড়ী হইতে স্কুলে রওনা হইতেন, কিন্তু মাসের মধ্যে অন্ততঃ বিশদিন শিক্ষকগণ তাঁহার টিকি দেখিতে পাইত না। কলেজের নিকট একটা তাঁহাদের আড্ডা ছিল, দুই প্রহরে তাঁহারই ন্যায় অন্যান্য বালকগণ সকলে একত্র হইয়া সেখানে তাস, দাবা প্রভৃতি খেলিত, পড়াশুনার কাছ দিয়াও যাইত না। সুরেশ তাহাদের সকলের কর্ত্তা, দলপতি; যত রকম নষ্টামির সর্দ্দার।

সুরেশের এরূপ স্বভাবে তাঁহার পিতামাতা যে প্রাণে বিশেষ বেদনা পাইতেন, তাহা বলা বাহুল্য। মায়ের নিকট তিনি বড়ই আদরের ছেলে ছিলেন; পারতপক্ষে তাঁহার স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু পিতা গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস কিরূপে চক্ষের উপর পুত্রকে অধঃপাতে যাইতে দিবেন, তিনি বুঝাইয়া ধমকাইয়া, মারিয়াও পুত্রকে পড়াশুনায় মন দেওয়াইতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার পিতার হৃদয়ে যে নিতান্তই কষ্ট হইবে, ইহার আর অধিক কথা কি?

সুরেশ গাধা ছেলে ছিলেন না। তিনি যে খুব বুদ্ধিমান্, তাহা তাঁহার শিক্ষকগণই বলিতেন; একটু যত্ন করিয়া লেখাপড়া করিলে তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন, তাহা তাঁহার পিতা, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক প্রভৃতি সকলেই জানিতেন, কিন্তু পড়াশুনা করিবার ছেলে সুরেশ নহেন, পড়ার নামে তাঁহার গায় জ্বর আসিত; স্কুলে, বাড়ীতে সর্ব্বদাই তিনি কিছু না কিছু অপকর্ম্ম করিতেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবেন, না পড়া শুনা করিবেন। মাষ্টারেরা হার

মানিয়াছেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না; বাটীর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পারিত না। এই সময়ে তাঁহার খুল্লতাত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাসের সহিতই মাত্র তাঁহার সম্প্রীতি ছিল, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পারিত না। তিনিও কাহাকে দেখিতে পারিতেন না। সুরেশের পিতামাতা উভয়েই এখন লোকান্তরে। জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় ও তাঁহার খুল্লতাত কৈলাস এখনও জীবিত আছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী হইতে এক্ষণে পেন্‌সন্ লইয়া কড়েয়ার বাড়ীতে আছেন। সুরেশ বরাবরই কৈলাস বাবুর নিকট চিঠিপত্র লিখিতেন। শেষে প্রায় বিগত ছয়বৎসরাবধি তাঁহার আর কোনও পত্রাদি আসে নাই।

এই সময়ে লণ্ডন-মিশন্ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, য়্যাণ্টন্‌সাহেব। তিনিও সুরেশকে ভাল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঘরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই সুরেশ তিরস্কৃত হইতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। অবশেষে পিতা নিতান্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করায় সুরেশ পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভয়ে মধ্যে মধ্যে ৫।৭ দিন আর বাড়ী যাইতেন না। অনেক খৃষ্টান্ বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, তিনি বাড়ী না গিয়া তাঁহাদেরই বাসায় আহারাদি করিয়া রাত কাটাইতেন। কাজেই খৃষ্টানের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহা এক্ষণে আর ছিল না। তিনি এক্ষণে বিনা দ্বিধায় খৃষ্টান্‌দিগের সহিত আহার-বিহার করিতেন, হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল না,—তিনি অন্য বিষয়েও যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন, ধর্ম্ম-আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার সকল বিষয়েই সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন। এই সময়ে খৃষ্টান্ মিশনারীগণ এ দেশীয়গণকে খৃষ্টান্ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন, সুরেশকেও খৃষ্টান্ করিবার জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা বলা

বাহুল্য। আমরা এই স্থানে মিশনারী ও মিশন্ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

মিশনারী সাহেবদিগের দ্বারা দেশের যে উপকার হয় নাই, এ কথা আমরা বলি না; তবে বিলাতের লোকের বিশ্বাস যে, যাঁহারা মিশনারী হইয়া এ দেশে আইসেন, তাঁহারা আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, মিশনারী সাহেবেরা এদেশে বড়ই কষ্টে কালযাপন করেন। এ কথা যে সত্য নহে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এ দেশে মিশনারী সাহেবেরা অতিসুখস্বচ্ছন্দেই কালাতিপাত করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান্দেশবাসিগণ মুক্তহস্তে মিশনের জন্য অর্থ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—কুসংস্কারাবিষ্ট, অন্ধকারে মগ্ন, কাষ্ঠ-প্রস্তর-পূজক ভারতবাসিগণকে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম প্রদানের জন্য মিশনারীগণ এ দেশে আসিয়া থাকেন। এই মহৎকার্য্যসাধনের জন্যই তাঁহারা অবারিতরূপে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার যে কিছুই হয় না, তাঁহাদের অর্থ যে কেবল অপব্যয়িত হয়, তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা প্রয়াস পাইব।

ইংরাজ সওদাগরগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইংরাজ মিশনারীগণ আসেন নাই। তাঁহারা এদেশে ব্যবসা করিতে আসিয়া যখন দুর্ব্বল বিলাসাসক্ত মোগল সম্রাট্‌কে সরাইয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য স্থাপনা করিলেন, সেই সময়ে ইংরাজ মিশনারীগণও ভারতে আসিয়া দেখা দিলেন। পরের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজ্যবিস্তার করিতে স্বাধীনচেতা ইংরাজ জাতির প্রাণে বেদনা লাগে। ভারতে রাজ্যস্থাপন হইল, ভারতবাসীর স্বাধীনতা হৃত হইল, একটা কিছু মহৎ উদ্দেশ্য না দেখাইলে, অন্ততঃ একটা কিছু সৎ উদ্দেশ্যের কথা জগদ্‌বাসিসাধারণকে না বলিলে মহৎচেতা উদার ইংরাজজাতির প্রাণে পাছে বেদনা লাগে—জগৎ জুড়িয়া দুর্নাম রটে, তাহাই ভারতবাসীকে

কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ইংরাজ জাতি এদেশে মিশনারী পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের জন্য জলের ন্যায় অর্থ-ব্যয় করিতে লাগিলেন, দলে দলে মিশনারী আসিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নগরে নগরে মিশন্-স্থাপনা হইল। স্থানে স্থানে মিশনারী সাহেবদিগের বাসের জন্য রাজপ্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইল। যাঁহারা ভারতবাসীকে উদ্ধার করিবার জন্ম মিশনারী হইয়া আসিতে লাগিলেন;—তাঁহাদের স্বদেশীয়গণ তাঁহাদিগকে স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বলতম আদর্শ মনে করিতে লাগিলেন। সুদূর ভারতে,—উষ্ণপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষ্ণমূর্ত্তি বিধর্ম্মীদিগের মধ্যে বসবাসে না জানি, এই সকল মহাত্মার কত কষ্টই হইবে। এই ভাবিয়া দেশের লোক, যাহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট না হয়, সে জন্য মুক্তহস্তে অর্থপ্রদান করিতে লাগিলেন। জগতের লোক বুঝিল যে, ইংরাজগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারত গ্রহণ করেন নাই,—ভারতবাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন;—ভারতের মঙ্গলসাধনই তাঁহাদের একমাত্র অভিপ্রায়।

প্রথমে তাঁহারা ভারতবাসীকে খৃষ্টান্ করা অপেক্ষা তাহাদিগকে ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য সমধিক প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাহাদিগকে আপ্যায়িত-বশীভূত করিবার জন্য তাহাদের পীড়ায় ঔষধ দিতে থাকিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজী-শিক্ষাবলে যখন তাহাদের-বৎসরব্যাপী কুসংস্কার, পুত্তলিকা-পূজা, আচার-ব্যবহার নষ্ট হইবে; তখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতে আর অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না। এইজন্য তাঁহারা দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দেশ ইংরাজের হইয়াছে। রাজার সমস্ত কার্য্যই রাজভাষায় সম্পন্ন হয়, এরূপ স্থলে দেশের লোকের ইংরাজী না জানিলে উপার্জ্জন হয় না;—কোন কার্য্যই চলে না। কাজে কাজে দলে দলে এ দেশের

বালকগণ মিশনারীদিগের স্থাপিত স্কুল-কলেজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন ইংরাজী শিক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না। তখন গবর্ণমেণ্ট এখনকারমত দেশে শিক্ষা-বিস্তারের কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই। এখনকার মত তখন এদেশীয়গণ নিজেরাও কোন স্কুল-কলেজ স্থাপনা করেন নাই। এদেশের লেখাপড়ার ভার কাজে কাজেই একরূপ মিশনারীদিগের হাতে পড়িল। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত এইরূপে এদেশে প্রবিষ্ট হইল। দিন দিন সকল প্রকারে দেশের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নানা লোভে পড়িয়া অনেকে খ্রীষ্টান্ হইল। এই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় পেটের দায়েও অনেকে খ্রীষ্টান্ হইয়া পড়িল। ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষা এই সকল লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে খ্রীষ্টান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যাহারা খ্রীষ্টান্ হইয়াছে, তাহারা অধিকাংশই নীচজাতীয় দারিদ্র্য-প্রপীড়িত! মফঃস্বলস্থ অনেক খ্রীষ্টান্ উপনিবেশ আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি; এই সকল দেশীয় খ্রীষ্টান, আনড্রু পেনড্রু গমেশ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কিছুই অবগত নহে; ঘোর কুসংস্কারে নিমগ্ন ও অজ্ঞতায় পূর্ণ! ইহারা খ্রীষ্টান্ হইবার পূর্ব্বে যেরূপ কালী, শীতলা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবী-মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিত, ঠিক সেইরূপ এখনও করে। যদি ইহাদের খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে কখনই এরূপ করিতে পারিত না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, শিক্ষিতদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্রীষ্টান্ হইয়াছেন, তাঁহারা এখন অনুতপ্ত। কেহ কেহ স্পষ্টই বলেন যে, যখন তাঁহাদের সাংসারিক জ্ঞান ছিল না, মিশনারীগণ তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টান্ করিয়াছিলেন। যতসংখ্যক খ্রীষ্টান্ করিতে পারা যায়, ততই মিশনারী সাহেবের আয়বৃদ্ধি হয়. এরূপস্থলে মিশনারীগণ যে নানা কল কৌশলে এদেশীয়দিগকে খ্রীষ্টান্ করিবার চেষ্টা পাইবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এরূপে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া খ্রীষ্টান্-

সমাজের কি লাভ বা উপকার হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। যখন যে দেশে যাহা তিনি করিতেছেন, তখন তাহাই ঘটিতেছে; মনুষ্যের তাহাতে হাত নাই। এক সময়ে এ দেশে খ্রীষ্টান্-ধর্ম্মের খুব ধূয়া উঠিয়াছিল, অনেক লোক খ্রীষ্টান্ হইয়াছিল,—এক্ষণে সে ঢেউ একেবারে গিয়াছে,—এখন আর বড় কেহ খ্রীষ্টান্ হয় না। ভারতে প্রাচীন সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মেরই প্রতাপ দিনদিন বাড়িতেছে, এমন কি, ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট আদর করিতেছেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এ আশা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ ইয়োরোপবাসিগণকে হিন্দু করিতে চাহেন না তাঁহারা নির্ব্বিবাদে তাঁহাদের নিজধর্ম্মে থাকিতে পারিলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েন।

যদিও খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম এদেশে আসিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ ক্ষতি করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষতি এত সামান্য যে, তাহাকে ক্ষতি বলিয়া গণ্য না করাও যাইতে পারে; কিন্তু এ কথাও বলিতে হইবে যে, খ্রীষ্টান্ মিশনারীদিগের দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকারসাধন হইয়াছে, তাঁহারাই এদেশে সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষা-বিস্তার করিয়া এদেশের জনসাধারণের পক্ষে বিদ্যালাভ সুলভ-সাধ্য করিয়াছেন; তাঁহারা এদেশে ঔষধ বিতরণ করিয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রাণদান করিয়াছেন। শতসহস্র প্রকারে তাঁহারা এদেশের উন্নতির চেষ্টা পাইয়াছেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ না থাকিলে অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করা হইবে।

---

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## খ্রীষ্টান্ সুরেশ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সুরেশ খ্রীষ্টান্ হইয়াছেন। যিনি বাল্যকালে এত হিন্দু ছিলেন, যিনি নীলকুঠীতে সাহেবদিগের নিকট রাত্রিযাপন করিলে জাতি যাইবে মনে করিয়াছিলেন, তিনি কিরূপে অবশেষে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব।

তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে তাঁহার প্রিয় খুল্লতাত কৈলাস বাবুও তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; তিনিও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কৈলাস বাবুর অপেক্ষা গিরিশ বাবু কড়া লোক ছিলেন; তিনি পুত্রের এইরূপ চরিত্রে বিশেষ ক্রোধান্ধ হইলেন। একদিন সুরেশকে আগাগোড়া বেত লাগাইলেন,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! খ্রীষ্টান্‌দিগের মধ্যে থাকিয়া সুরেশের হিন্দুধর্ম্মে একেবারেই আস্থা লোপ পাইয়াছিল। মহাবৈষ্ণব গিরিশ বাবুর চক্ষে ইহা মহাপাতক বলিয়া প্রতীত হইল; তিনি পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া, প্রহার করিয়া নিরস্ত হইলেন না,—তাঁহাকে ত্যাজ্য-পুত্র করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন।

উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল সুরেশ, পিতার তাড়নায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বালককাল হইতেই তিনি স্বাধীনচেতা; পরের অধীনে পরের করতলস্থ হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পিতার শাসন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, পিতাকেও ত্যাগ করিয়া সকলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য

ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কেবল এক জননী; তাঁহারই স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সুরেশ এখনও গৃহ-ত্যাগ করেন নাই। পিতাকর্ত্তৃক ভৎ র্সিত বা প্রহারিত হইলে তাঁহার স্নেহময়ী জননীই তাঁহাকে কোল দিয়া তাঁহার হৃদয়ে শান্তিবারি প্রদান করিতেন।

একদিকে পিতা পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার জন্য ক্রমে হৃদয়কে দৃঢ় করিতেছেন, অপরদিকে পুত্রও গৃহ, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। এইরূপ গৃহবন্ধন আর কয়দিন রহে? একদিন পিতাপুত্রে মহাবচসা উপস্থিত হইল; পুত্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না, আর জীবন থাকিতে গৃহে ফিরিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া সুরেশ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; তিনি বরাবর লণ্ডন্‌মিশনস্থ তাঁহার খ্রীষ্টান-বন্ধুদিগের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদের নিকট হৃদয় খুলিয়া সকল কথা—প্রাণের সমস্ত দুঃখ—বলিলেন; তাঁহার যেরূপ মনের ভাব, বন্ধুগণও ঠিক সেইভাব ব্যক্ত করিলেন। দুর্ব্বলতা কিছুই নহে, যাহার হৃদয়ে বল নাই, তাহার কিছুই নাই। কোন ক্রমেই আর তাঁহার উপস্থিত কিয়দ্দিন বাড়ী যাওয়া কর্ত্তব্য নহে;—তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন। সুরেশের প্রাণে তাঁহাদের কথা লাগিল, তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সেই দিন হইতে তিনি আত্মীয়স্বজনের সহিত আর কোন সম্বন্ধই রাখিবেন না। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে, যতদিন তাঁহার ইচ্ছা ততদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যৌবনে যুবকগণ ভবিষ্যৎ বিপদাপদের কথা একেবারেই ভাবেন না। যাঁহারা সুরেশকে এইরূপে আমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না যে, তাঁহাদের জনকজননীগণ এরূপ বন্ধু-আপ্যায়নে প্রীত হইবেন কি না!

সুরেশ কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে,

তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তেমন ধনী নহেন ;—তাঁহাদের বা অন্য কাহারই গলগ্রহ হইয়া থাকা স্থরেশের প্রকৃতিতে লেখে নাই ;—স্বাধীনচেতা স্থরেশ কাহারই ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে সম্মত নহেন। এই সকল কারণে স্থরেশ লণ্ডন-মিশনারী ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল য়্যাষ্টন্ সাহেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। স্থরেশ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়া সত্ত্বেও য়্যাষ্টন্ সাহেব স্থরেশকে স্নেহ করিতেন। তিনি মিষ্ট কথা কহিয়া তাঁহার প্রাণের শান্তির জন্য তাঁহাকে বাইবেল পড়িতে অনুরোধ করিলেন। স্থরেশের তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনার প্রয়াস পাওয়া বৃথা ;—হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ জন্মিয়াছে, কারণ, তাঁহার আত্মীয়গণ হিন্দু; হিন্দু নাম থাকিলে পাছে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে পুনরায় গৃহে লইয়া যাইতে আইসেন, এই ভয়ে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িলেন। স্থরেশ এখনও সাবালক নহেন, বয়স ত্রয়োদশবর্ষ মাত্র; তবে তিনি এম্‌নই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, আর কখনও বাড়ী ফিরিবেন না। এখন তিনি খ্রীষ্টান, গৃহশূন্য, অর্থশূন্য; অর্থোপার্জ্জন করিয়া যে আত্ম-পোষণ করিবেন, এ ক্ষমতাও তাঁহার হয় নাই। তবুও এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মন টলিল না,—তিনি ভীত হইলেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতই কেন কষ্ট হউক না, গৃহে কখনও ফিরিব না! তাঁহার খ্রীষ্টান্ হওয়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পিতা গিরিশ বাবু তাঁহাকে ত্যাজ্য-পুত্র করিলেন ও জীবনে আর তাঁহার মুখ দেখিবেন না শপথ করিলেন। স্থরেশ গৃহ-শূন্য, কলিকাতার রাজপথে সহায়হীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

য়্যাষ্টন্ সাহেব এই সময়ে নানারূপে স্থরেশকে সাহায্য করিয়া-ছিলেন। তিনি লণ্ডন্ মিশন্ কলেজে তাঁহাকে বাস করিতে দিয়া-

ছিলেন ;—সুরেশের ভোজন ও বাসের জন্য এক পয়সাও লাগিত না। ইচ্ছা করিলে তিনি লেখাপড়া শিখিয়া, বিদ্বান্ হইয়া, অন্যান্য দেশীয় খ্রীষ্টান্‌দিগের ন্যায় ভবিষ্যতে সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন ; কিন্তু সুরেশের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। লেখাপড়া করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই ; অথচ তিনি পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার পাত্রও নহেন। কাজেই তিনি কোনরূপ একটা চাকুরী জোগাড়ের জন্য চারিদিকে নানাস্থানে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু নানাস্থানে চেষ্টা করিয়াও সুরেশ কোন চাকুরী জোগাড় করিতে পারিলেন না। একে তাঁহার বয়স অল্প, তাহার উপর লেখাপড়া কম, তাঁহাকে কে কি কার্য্য দিবে! তিনিই বা কি কার্য্য করিতে পারিবেন ?

গবর্ণমেণ্ট আফিস, সওদাগরি আফিস, রেল আফিস, ডক, জেটি ;—যেখানে কোন চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা আছে, সুরেশ সেইখানেই গেলেন, কিন্তু কোথাও কিছু হইল না। লোকে তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া বরং তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। বিশেষতঃ তিনি খ্রীষ্টান্ হইয়াছেন শুনিয়া দেশীয় কেরাণীগণ তাঁহাকে নানারূপ অপমানিত করিতেন। সুরেশ বাধ্য হইয়া এই সকল হাসিবিদ্রূপ সহ্য করিতেছিলেন ; উপায় নাই! ক্রমে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, অচিরে একটা না একটা কোন কিছু না করিলে নয়!

তাঁহার চাকুরীর বয়স নহে ; তাঁহার পিতা বা আত্মীয়স্বজনের এরূপ অবস্থা নহে যে, তাঁহাকে এই বয়সে চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া কলিকাতার রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়! উচ্ছৃঙ্খল না হইলে তাঁহার পিতা-খুল্লতাত আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে আদর-যত্ন করিতেন ; তাঁহারও কর্ত্তব্য ছিল, এ বয়সে এরূপ করিয়া না বেড়াইয়া লেখাপড়ায় মন দিয়া বিদ্বান্ হইবার চেষ্টা করা। তিনি স্ব-ইচ্ছায় সে সমস্ত নষ্ট করিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়াছেন ;—স্ব-ইচ্ছায় বিপদকে ডাকিয়া

আনিয়াছেন ;—তিনি ক্রোধে গৃহ-ত্যাগ করিয়া স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত দিয়াছেন ;—পিতৃপুরুষের আদরের সনাতনধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! এরূপ অবস্থায় তাঁহার ক্লেশের জন্য একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কে দায়ী?

যখন নিরাশার মেঘ সুরেশের হৃদয়কে আবরিত করিতেছিল, যখন তিনি হতাশ হইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জীবনের সেই ঘোর-অমানিশার মধ্যে একটি ক্ষীণ আলোক দেখা দিল। তিনি স্পেন্সেস্ হোটেলে একটী সামান্য চাকুরী পাইলেন। জাহাজের ঘাটে ও রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে থাকিতে হইত; কোন সাহেব মেম দেশান্তর হইতে আসিয়া পৌছিলে, তিনি তাঁহাদিগকে স্পেন্সেস্ হোটেলে লইয়া আসিতেন। তাঁহাদের মালামাল রেল বা জাহাজ হইতে আনা, বা রেলে বা জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া ;—তাঁহাদিগকে কলিকাতার নানা দর্শনীয় স্থান সকল দেখান; ইহাই সুরেশের কার্য্য ছিল। সুরেশ বিশুদ্ধ ইংরাজী বলিতে না জানিলেও বেশ তাড়াতাড়ি ইংরাজী বলিতে পারিতেন। যে সকল সাহেব মেমের সহিত তাঁহাকে কথা কহিতে হইত, তাঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালা বা হিন্দী জানিতেন না সুতরাং সুরেশ যে ইংরাজী জানিতেন, তাহাতেই তাঁহার কাজ বেশ ভালরূপ চলিয়া যাইত। তিনি যে কাজে এই সময়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে অন্যত্র গিয়া অন্যরূপে জগদ্ব্যাপী নাম করিতে পারিবেন, তাহা সে সময়ে কে ভাবিয়াছিল? তবে এ সময়ে এইরূপে সাহেব-দিগের মধ্যে থাকিতে পাইয়া যে তাহাদিগের আচার-ব্যবহারের চাল-চলনের সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ বহুদর্শিতা জন্মিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপে সুরেশ কিয়দ্দিবস স্পেন্সেস্ হোটেলে রহিলেন; কিন্তু বহুদিন এ চাকুরী তাঁহার ভাল লাগিল না। এক কার্য্যে বহুদিন

মনোনিবেশ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি প্রত্যহই গঙ্গার তীরে যাইতেন; প্রায়ই সাহেবদিগকে আনিতে বা তুলিয়া দিতে জাহাজে যাইতেন। এইরূপে জাহাজে যাওয়া আসায়, তাঁহার প্রাণ বিলাত যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাত্রিদিন, শয়নে-স্বপনে, সর্ব্বদা তাঁহার একই চিন্তা; তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যে কোন উপায়ে একবার বিলাত যাইবেনই যাইবেন, তাহারই জন্য মনে মনে শতপ্রকার উপায় উদ্ভাবনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনটিই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া প্রতীত হইল না। এইরূপে মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, সুরেশের বিলাত ভ্রমণ-ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোনই সুবিধা সুযোগ ঘটিল না। যে সকল সাহেব বিলাত হইতে এদেশে বেড়াইতে আসিতেন এবং যাঁহারা স্পেন্সেস্ হোটেলে বাস করায় সুরেশের সহিত সর্ব্বদাই কথা-বার্ত্তা কহিতেন, সুরেশ তাঁহাদের অনেকের নিকট তাঁহার মনের বাসনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। সাহেবেরা তাঁহার কথায় কেবল মৃদু হাস্য করিতেন মাত্র!

সুরেশ জানিতেন, বিলাত যাইবার টাকার জন্য যদি তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত হইবেন মাত্র! তাঁহারা এক পয়সাও দিবেন না; উপরন্তু বিদ্রূপব্যঙ্গ ভৎ্সনা, তিরস্কার, অপমান পর্য্যন্ত করিবেন! তাঁহাকে সকলেই ভুলিয়াছিল, কেবল ভুলেন নাই তাঁহার স্নেহময়ী জননী। কিন্তু তাঁহার হাতে টাকা নাই যে, তিনি তাঁহাকে টাকা দিয়া তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করাইবেন! সুরেশের পিতার ভয়ে তিনি পুত্রের সহিত দেখা করিতেও সাহস করিতেন না। বাড়ীতে কেহ না থাকিলে তিনি কখন কখন সুরেশের কনিষ্ঠকে দিয়া সুরেশের প্রিয় আহারীয়

দ্রব্য তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেন ; সুরেশের খুল্লতাতও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কিন্তু ইহাতেও সুরেশের আন্তরিক আশা ফলবতী হইবার কোন কিছুই হইল না। সুরেশ তৃণের ন্যায় সংসার-স্রোতস্বিনা-বক্ষে ভাসিয়া চলিলেন।

সমুদ্র-যাত্রা করিয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিব, ক্রমে এ ইচ্ছা সুরেশের মস্তিষ্কের সহিত যেন সংমিশ্রিত হইয়া গেল। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সমুদ্র-যাত্রা, সমুদ্রে সমুদ্রে নাবিকদিগের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই যেন তাঁহার প্রকৃতি গঠিত—এ সকল যেন তাঁহার জীবনে অবশ্যম্ভাবী! ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানা পুস্তক পাঠ করিয়া, নানাদেশ-ভ্রমণে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কোন গতিকে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য সুরেশ উন্মত্ত হইলেন!

এ সময়েও তিনি লণ্ডন্-মিশন্ কলেজে বসবাস করিতেছিলেন। য়্যাষ্টন্ সাহেবও সপরিবারে সেই স্থানে থাকিতেন। তিনি বরাবরই সুরেশকে স্নেহ করিতেন,—এক্ষণে সুরেশ খ্রীষ্টান্ হইয়া একরূপ তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ আদরযত্ন করিতেন। অবসরমত একটু পড়াশুনা করিয়া সুরেশ আত্মোন্নতি করেন, য়্যাষ্টন্ সাহেব সর্ব্বদাই সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেন। এখন যেরূপ চাকুরীই সুরেশ করুন না কেন, লেখাপড়ার একটু উন্নতি করিলে যে ভবিষ্যতে ভাল হইতে পারে, য়্যাষ্টন্ সাহেব সর্ব্বদাই সুরেশের মনে এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন। সংসারে হয় বিদ্যা, নয় ধন না থাকিলে যে কেহই মানুষ বলিয়া গণ্য হয় না, তাহা এ সংসারে আমরা কে না বুঝি? য়্যাষ্টন্ সাহেব ইহা জানিতেন, এবং তাই তিনি সুরেশকে লেখাপড়ায় অবসর-মত মন দিতে বিশেষ জেদাজেদি করিতেন। কিন্তু তাঁহার সদুপদেশ বধির কর্ণে প্রদত্ত হইত! সুরেশের সহিত সরস্বতীর চির-বিবাদ;—

পড়া-শুনা করিবার লোক তিনি নহেন। কিরূপে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা; সর্ব্বদা এই ইচ্ছাই তাঁহার মস্তিষ্কে ঘূর্ণায়মান, পড়া-শুনা করিবে কে? ম্যাষ্টন্ সাহেব ইহা জানিতেন, তবুও তিনি সুরেশকে ভালবাসিতেন ও আদর যত্ন করিতেন। তিনি সুরেশকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ম্যাষ্টন্ সাহেব সুরেশের ছোট ভাইকে এই পত্রখানি দিয়া ফাদার লাফোঁ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন;—

"ইনি বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের ভ্রাতা। সুরেশ আমাদের ছাত্র এবং প্রায় ২১ বৎসর হইল খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম এবং আমাদের পরিবারে তিনি ছেলের মত ছিলেন; কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইল। বিলাত দেখিবার জন্য তিনি পাগল হইলেন। বি, আই ষ্টীমারের সহকারী ষ্টুয়ার্ড হইয়া তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি আমার পিতা-মাতার সঙ্গে দেখা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করেন। বিলাতে নানা কষ্ট পাইয়া অবশেষে তিনি জামরাক সাহেবের সার্কাসে চাকুরী পান; এবং শীঘ্রই তাঁহার দলে সিংহের সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে এই দলের সহিত তিনি ইয়োরোপের প্রায় সকল সহরে গিয়াছিলেন। এইরূপে নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি ব্রেজিলে উপস্থিত হন; এদেশে নানা চাকুরী করিয়া অবশেষে ব্রেজিলদেশীয় সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়েন। এক্ষণে উন্নতিলাভ করিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট হইয়াছেন।

"তিনি কতকগুলি প্লাকার্ড ও সংবাদপত্র তাঁহার আত্মীয়দিগকে পাঠাইয়াছেন। আমার বোধ হয়, এগুলি সব পর্টুগিজ ভাষায় লেখা। তাঁহার আত্মীয়গণ এগুলি অনুবাদ করাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র

হইয়াছেন। আমার মনে হইল, হয় ত আপনি বা ফাদারগণের মধ্যে অন্য কেহ পর্টুগিজ-ভাষায় ব্যুৎপন্ন থাকিতে পারেন। বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুবাদ করিবার বোধ হয় আপনাদিগের সময় হইবে না। ইহাদের ভাবার্থ পাইলেই আমরা বিশেষ অনুগৃহীত মনে করিব।”

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## ব্রহ্মে সুরেশ

যত সময় অতীত হইতে লাগিল, সুরেশের মন ততই কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। শেষে কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য তিনি এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন যে, এক দিন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কোংর আফিসে গিয়া রেঙ্গুনের একখানি ডেক্ টিকিট ক্রয় করিলেন। এত স্থান থাকিতে রেঙ্গুনে যাইবার জন্য তিনি কেন ইচ্ছুক হইলেন, ইহার উত্তরে মনে হয় যে, বিলাত যাইবার কোন উপায় না দেখিয়া সুরেশ বর্ম্মায় যাওয়াই স্থির করিলেন। অল্প পয়সায় জাহাজে নূতন দেশে যাইতে ইচ্ছা করিলেই রেঙ্গুন সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থান। যেথানেই হউক, দেশ হইতে অন্যত্র গিয়া কোন কার্য্যকর্ম্ম করাই তাঁহার একান্ত বাসনা।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ব্রহ্মদেশ এথনকার মত সভ্য বা ইংরাজ-রাজ্যের সুশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হয় নাই। উপর-ব্রহ্ম তথনও দেশীয় রাজার অধীন ছিল;—লোয়ার-বর্ম্মা ইংরাজগণ দথল

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই; ইংরাজী-জানা লোকেরও তখন ব্রহ্মদেশে বিশেষ অভাব ছিল। এই সকল কারণে সেখানে গেলে চাকুরী সহজে মিলিবার সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তিনি রেঙ্গুনে যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই সুরেশ নির্ব্বিঘ্নে রেঙ্গুনে আসিয়া পৌছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার হস্তে সামান্যমাত্রই অর্থ ছিল; যাহা ছিল, কোন কাজ না মিলিলে তাহাতে বহুদিন চলিবার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই সুরেশ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, জাহাজ হইতে নামিয়াই কোন কাজের চেষ্টা করিবেন। নূতন স্থানে নূতন লোকের মধ্যে তিনি আসিলেন;—তিনি কাহাকেও চিনেন না, কেহ তাঁহাকে চিনে না। যেখানে খুব সস্তায় থাকিতে পারা যায়, প্রথমে তিনি সেইরূপ একটি বাসা খুঁজিতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে জাহাজ হইতে নামিয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত একটি বন্ধুর সহিত দেখা হইল। ইনি রেঙ্গুনে চাকুরী করিতেছিলেন। সুরেশের নিকট সকল শুনিয়া তিনি তাঁহাকে নিজ বাসায় লইয়া গেলেন। সুরেশের বাসার জন্য আর ভাবিতে হইল না। এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে তিনি কোন কাজের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

যেখানে যেখানে চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা, পরদিন হইতেই সুরেশ সেই সেই স্থানে গিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন রেঙ্গুন যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, সুরেশ যখন গিয়াছিলেন, তখন সেরূপ ছিল না। এরূপ অপরিষ্কার সহর জগতের অন্যত্র কোন স্থানে ছিল কি না বলা যায় না। তাহার উপর সহরের রাজপথে রাত্রে দলে দলে বদমাইসগণ ফিরিত;—কাহাকে একাকী নির্জ্জনে পাইলে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। সুবিধা পাইলে খুন করিতেও তাহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না। এই সকল দুর্ব্বৃত্ত মগ প্রায়

লুঠপাট করিয়া ধৃত হইত না। পুলিশ ইহাদের কিছুই করিতে পারিত না। এমন কি, দিনের বেলায়ও ইহারা ইহাদের অস্ত্র দা হস্তে লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি ঘুঁজিতে লুঠের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিত, সুবিধা পাইলেই লোকজনের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। এরূপ বিপদসঙ্কুল সহর পৃথিবীর আর কুত্রাপি ছিল না; এত দুর্ব্বৃত্ত লোকও বোধ হয় অন্যত্র দেখা যাইত না। মগেরা চিরকালই লুঠপাট করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত; তজ্জন্যই "মগের মুল্লুক" এখনও অরাজকতার উপমাস্থল! যখন সুরেশ রেঙ্গুন গিয়াছিলেন, তখনও এই স্থানের মগগণ পূর্ব্ব-স্বভাব ভুলিতে পারেন নাই।

সুরেশের বন্ধু তাঁহাকে এসকল কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন,—কিন্তু ভয় কাহাকে বলে, সুরেশ তাহা জানিতেন না; বন্ধুর কথায় যে তিনি বিশেষ কর্ণপাতও করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। বিশেষতঃ তিনি গৃহে বসিয়া থাকিতে পারেন না; চাকুরীর চেষ্টায় তাঁহাকে সকল সময়েই সহরের সকল স্থানে যাইতে হইতেছে! বদ্মাইসের ভয় করিলে চাকুরীর চেষ্টা করা হয় না।

---

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## মগডাকাত ও সুরেশ

একদিন সুরেশ রেঙ্গুন নদীতে নৌকারোহণ করিতে গেলেন; সে সময়েও তিনি নৌকা চড়িতে বড়ই ভালবাসিতেন। যদিও তাঁহার অর্থের স্বচ্ছলতা একেবারেই ছিল না, তবুও সুন্দর ইরাবতী নদীর

স্বচ্ছজলে একবার নৌকারোহণ না করিয়া তিনি নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। কিছু দিয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাড়া করিয়া তিনি বহুক্ষণ ইরাবতী নদীতে নৌকা চড়িয়া বেড়াইলেন। ক্রমে ফিরিয়া ঘাটে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল; তখন তিনি নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। নৌকার দাঁড় টানিয়া তিনি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে পদব্রজে যাইবার সময় তাঁহার শরীরে মৃদু মধুর বাতাস লাগায় তাঁহার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে রেঙ্গুনের রাস্তায় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তিনি তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন! তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, এমন কি, তাঁহার হস্তে একটি যষ্টিও নাই; তবে কলিকাতায় বাল্যকাল হইতেই তিনি একগাছি ছোট রুল সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন, এখানে সেটি ছাড়িয়া তিনি কখন কোন স্থানে যাইতেন না। অদ্য তাঁহার সঙ্গে তাঁহার চিরসহচর রুলগাছটি ছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আকাশে তারকারাজি একে একে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; চন্দ্র না উঠিলেও রাস্তা একেবারে অন্ধকার হয় নাই; মধ্যে মধ্যে কোন কোন দোকান হইতে আলো পড়িয়া রাস্তা আলোকিত করিয়াছে। সন্ধ্যার পর রেঙ্গুনের রাস্তায় বড় লোক-চলাচল করে না; সুরেশ দুই দশ জন দরিদ্র মগকে গৃহে ফিরিতে দেখিতে পাইলেন। বাঙ্গালা দেশের শ্রমজীবিগণ যেরূপ সমস্ত দিনের পর গৃহে ফিরিবার সময় গলা ছাড়িয়া গান করে, মগেরা তাহা করে না। সুরেশ যাহাদিগকে দেখিলেন, তাহারা নীরবে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। তিনিও নীরবে বাসার দিকে যাইতে-ছিলেন; নানা চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাকুলিত। একবার ঘোর হতাশা আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতেছে, আবার পর-মুহূর্ত্তেই আশায় মনঃপ্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যাহা হইয়া গিয়াছে,

যাহা হইবে এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সুরেশ বাসার দিকে আসিতেছিলেন।

সহসা একটা শব্দে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন, কি একটা তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সেটা নিকটস্থ প্রাচীরে গিয়ে লাগায় সুরেশ শব্দ বুঝিলেন, সেখানি দা, দূর হইতে কে ছুড়িয়াছে। তিনি দাঁড়াইলেন, গলিটি ভাল করিয়া দেখিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একখানি দা তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। কেবল অদৃষ্টবলে এই শাণিত দা দুখানা তাঁহার গায়ে লাগিল না; লাগিলে তিনি হত না হইলেও যে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তিনি অন্ধকারে দুই ব্যক্তিকে অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর সময় নাই! তিনি দেখিলেন যে, ঐ দুই ব্যক্তি তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তখন তাঁহার বন্ধুর কথা মনে পড়িল, রেঙ্গুনের রাস্তায় যে নানা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা তিনি এখন বুঝিলেন। আর তাঁহার জীবনের আশা নাই, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। যম যে তাঁহাকে মৃত্যুর জন্যই রেঙ্গুন আনিয়াছেন, তাহাও তিনি ভাবিলেন; কিন্তু মরিতে তিনি ভীত নহেন! ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। যদি মরিতে হয়, বীরের ন্যায় মরিব, মনে মনে ইহা স্থির করিয়া তিনি সুদৃঢ়রূপে রুল ধরিলেন।

মগ দুজন তাঁহার নিকটস্থ হইল। একটা চতুর্দ্দশবর্ষীয় বাঙ্গালী বালককে আক্রমণ করিয়া লুঠিয়া লওয়া অতি সহজ কার্য্য ভাবিয়া তাহারা কেবলমাত্র একজন সুরেশকে ধরিতে আসিল। অমনি সুরেশ এমনই বজ্রমুষ্টিতে রুলদ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, যে সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া পড়িল। তখন অপর মগ একটু থমকাইয়া পড়িল, কিন্তু সুরেশ তাঁহার রুল দ্বারা তাহাকে প্রহার করিবার পূর্ব্বেই

সে আসিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল;—হ্যাচ্ কাটান মারিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রুল কাড়িয়া লইল। তখন সুরেশ তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, দুইজনে ঘোর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই সেই অন্ধকারময় রাজপথে পড়িয়া গিয়া উভয়েই উভয়কে পরাজিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সুরেশ দেখিলেন মগ তাঁহা অপেক্ষা বলবান্,—আর কিয়ৎক্ষণমধ্যেই সে তাঁহার অস্থি চূর্ণ করিয়া দিবে, সে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সবলে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার সহায়; সে দিন তাঁহার মৃত্যুদিবস নহে। তিনি যখন প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, ঠিক সেই সময়ে সেই রাস্তায় অনেক আলো দেখিতে পাওয়া গেল; লোকের কোলাহলও শ্রুত হইল; অমনি সুরেশ 'ডাকাত ডাকাত' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যাঁহারা আসিতেছিলেন, তাঁহারা বরযাত্রী। তাঁহার চীৎকারে তাঁহারা সত্বর সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দস্যু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার সঙ্গীকে টানিয়া লইয়া অন্ধকারে একটা গলির ভিতর অন্তর্দ্ধান হইল। সুরেশ তাঁহার মুক্তিদাতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

---

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

## অগ্নিকাণ্ডে সুরেশ

কয়েক দিন ধরিয়া প্রত্যহ সুরেশ রেঙ্গুনের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী আফিস ঘুরিয়া বেড়াইলেন। যেখানে যাঁহার হস্তে কোন চাকুরী প্রদানের ক্ষমতা আছে, তাহারই সহিত দেখা

করিলেন; কিন্তু চাকুরী পাওয়া দূরে থাকুক, চাকুরী পাইবার যে কোনরূপ আশা আছে, এরূপও বোধ হইল না। তখন তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া প্যাগোডা সজ্জিত রেঙ্গুন নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পূর্ণশনির দশা, সহস্র চেষ্টা করিয়াও তিনি কোন বিষয়েই সুবিধা করিতে পারিলেন না।

যে রাত্রে তিনি রেঙ্গুন হইতে রওয়ানা হইবেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় তিনি রেঙ্গুনের রাজপথে একবার শেষ বেড়াইতে বাহির হইলেন।—তিনি কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাঁহার কর্ণে মনুষ্য-কোলাহল প্রবেশ করিল;—তিনি একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিলেন, নিকটে আগুন লাগিয়াছে। সুরেশ এরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ছিলেন না। "আগুন আগুন" চীৎকার শুনিয়াই তিনি দৌড়াইয়া সেই দিকে গেলেন। দেখিলেন একটি বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, সেই সময়ের প্রবল বাতাসে আগুন ক্রমে ভয়ানক প্রবল হইয়া উঠিতেছে, নিকটস্থ দুই একটি বাড়ীতেও লাগিয়াছে। হাজার হাজার লোক সেইখানে জমিয়াছে, কিন্তু জন কয়েক ব্যতীত অপর সকলে দাঁড়াইয়া কেবল তামাসা দেখিতেছে। যাহারা জল লইয়া আসিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহারা শতচেষ্টাতে আগুনকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছিল না। বাতাসের সহায়তা পাইয়া আগুন ভয়াবহভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশ নিকটে গিয়া, যাহারা আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতেছিল, যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাদের শতচেষ্টায় আগুন নিবিল না,—একের পর অন্য বাটী গ্রাস করিতে লাগিল!

সহসা সেই মহা-কোলাহল ভেদ করিয়া একটি রমণীর আর্ত্তনাদ

শ্রুত হইল। সকলে চমকিত হইয়া বাড়ীর দিকে চাহিল, দেখিল—এক যুবতী সেই অগ্নি-প্রজ্বলিত বাটীর দ্বিতলস্থ গবাক্ষে অগ্নি ও ধূমের মধ্যে দণ্ডায়মানা, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, হস্ত প্রসারিত! বদন আকাশের দিকে উত্তোলিত! দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ভয়ে যুবতীর চক্ষু বিস্ফারিত, রক্ষা পাইবার আশায় হস্ত প্রসারিত ও ভগবানের প্রতি দৃষ্টির জন্য বদন আকাশের দিকে উত্তোলিত! এ দৃশ্য দেখিয়া জনতাস্থ সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ে বিশেষ বেদনা উদ্ভূত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু কেহই সে রমণীকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। এক্ষণে সমস্ত বাটীটিকে অগ্নি যেরূপ গ্রাস করিয়াছিল, তাহাতে এই রমণীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা আর স্বেচ্ছায় আপন প্রাণ উৎসর্গ করা একই কথা! সেই সহস্র লোকের চক্ষের সম্মুখে যুবতীকে অগ্নিতে ঘেরিল, আর রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই! দর্শকগণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া এই ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিতে লাগিল, কাহারও মুখ হইতে একটি শব্দও বাহির হইল না!

এইরূপে এই রমণী চক্ষের উপর অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে, সুরেশের প্রাণে ইহা সহিল না। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং তখনই অমনি চীৎকার করিয়া নিকটস্থ লোকজনকে একখানা মই আনিতে বলিলেন। জনতাস্থ সকলেই রমণীর জন্য বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা হইবে, ইহাতে তাঁহাদের সকলের হৃদয়ই উৎফুল্ল হইল, কয়েকজন ছুটিয়া গিয়া একটা মই আনিল। তখন সেই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক সুরেশ এক কলসী জল নিজের মাথায় ঢালিয়া চক্ষের নিমেষে মই বাহিয়া অগ্নিপরিবেষ্টিত সেই গবাক্ষের নিকট উঠিলেন। জনতাস্থ লোকেরা তাঁহার অসীম সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত

হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; স্পন্দিত-হৃদয়ে বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব সাহসিক কার্য্য দেখিতে লাগিল।

সুরেশ লম্ফ দিয়া অগ্নিময় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। রমণী তখনও সেইরূপভাবে সেইখানে দণ্ডায়মানা! বোধ হয়, তাঁহার সংজ্ঞা নাই, তাঁহার চারিদিকে মহারোলে অগ্নি জ্বলিতেছে, ধূমে গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে সুরেশ বা রমণী কাহারই প্রাণ রক্ষা হইবার সম্ভবনা নাই। কিন্তু রমণী নীরব, নিস্তব্ধ, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা! তাঁহার কেশদাম আলুলায়িত, অর্দ্ধদগ্ধ, তাঁহার বস্ত্র উন্মুক্ত, তাঁহার হস্ত প্রসারিত; আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিজের আর কোন ক্ষমতাই নাই! তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা বুঝিলেন;—তিনি একবার ফিরিয়া গবাক্ষের দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন, ধূ ধূ করিয়া গবাক্ষ জ্বলিতেছে; —সে পথে বহির্গত হইয়া যাইবার আর উপায় নাই! তিনি ব্যাকুল-নেত্রে গৃহের চারিদিকে চাহিলেন;—কোন দিক্ দিয়া বাহির হইবার উপায় নাই;—অগ্নি ঘোর রোলে চারিদিক্ ঘেরিয়াছে! তখন সুরেশ অনন্যোপায় হইয়া সবলে সেই গবাক্ষে পদাঘাত করিলেন;—ভীম পদাঘাতে সেই অর্দ্ধ-দগ্ধ গবাক্ষ মহাশব্দে খসিয়া নীচে গিয়া পড়িল। তিনি নিমেষ মধ্যে রমণীকে কোলে তুলিলেন, নিমেষ-মধ্যে ভগ্ন গবাক্ষমুখে আসিলেন,—কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশ! জানালার সঙ্গে সঙ্গে আঘাত লাগিয়া মইও নিম্নে পতিত হইয়াছে!

তিনি চীৎকার করিয়া নিম্নস্থ লোকদিগকে আবার প্রাচীরে মই লাগাইতে বলিলেন। গোলযোগে ও লোকের কোলাহলে প্রথমে তাঁহার কথা কেহ শুনিতে পাইল না।—তিনি তখন মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন। যখন নিম্নস্থ লোকেরা তাঁহাকে দেখিল ও তাঁহার কথা বুঝিল, তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ মই লাগাইয়া দিল এবং ৮।১০

জনে সবলে সেই মই চাপিয়া রাখিল। সুরেশ অতি কষ্টে রমণীকে ক্রোড়ে লইয়া মই অবলম্বনে ক্রমে নিম্নের দিকে আসিতে লাগিলেন। যখন অর্দ্ধেক নামিয়াছেন, তখন সহসা মই ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি রমণীসহ নিম্নে পড়িলেন। কিন্তু নিম্নস্থ লোকেরা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের উভয়কেই ধরিল ;—নতুবা উভয়েই যে গুরুতর আঘাত পাইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুরেশ নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল ;—তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন! বলা বাহুল্য তিনি অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াছিলেন ;—বিশেষতঃ ধূমে তাঁহার প্রায় শ্বাসরোধ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি নিম্নে পৌছিলে তাঁহার যে কি হইল, তাহা আর তাঁহার জ্ঞান নাই। যখন তাঁহার সংজ্ঞা হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে শায়িত আছেন ;—যে রমণীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি ও তাহার আত্মীয় মগগণ বিশেষ যত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পকেটে একখানা কাগজে তাঁহার বন্ধুর ঠিকানা দেখিয়া লোকেরা তাঁহাকে সেইখানে লইয়া আসিয়াছিল ; নতুবা হয়ত তাঁহাকে অপরিচিতের আলয়ে যাইতে হইত।

রমণীর শুশ্রূষায় কয়েকদিনের মধ্যেই সুরেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন ; —কিন্তু তিনি বুঝিলেন, যে, রমণী তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি এই ভালবাসার প্রতিদান করিতে অক্ষম। এই ব্যাপারে তিনি সেই মগ-রমণীর হৃদয়ে যে বেদনা দিলেন, তাহাতে তিনি নিজেও হৃদয়ে বিশেষ বেদনা পাইলেন ; কিন্তু উপায় নাই! তিনি অগত্যা যথা-সম্ভব সত্বর রেঙ্গুন-ত্যাগ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## মান্দ্রাজে সুরেশ

রেঙ্গুন হইতে সুরেশ কলিকাতায় ফিরিলেন না। রেঙ্গুনে মান্দ্রাজীর সংখ্যাই অধিক; এমন কি, রেঙ্গুনের রাজপথে মগ অপেক্ষা মান্দ্রাজী বারবনিতা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি রেঙ্গুনে অবস্থান-কালীন অনেক মান্দ্রাজীর সহিত পরিচিতও হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার একবার মান্দ্রাজ দেখিবার ইচ্ছা হইল। মান্দ্রাজকে সকলেই "অন্ধকারাবৃত দেশ" বলিত,—তখনও মান্দ্রাজে উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই সুরেশ মনে মনে ভাবিলেন, সম্ভবত মান্দ্রাজে চেষ্টা করিলে তিনি কোন না কোন চাকুরী জোগাড় করিতে পারিবেন। এই সকল ভাবিয়া তিনি একটু সুস্থ হইয়া উঠিবামাত্রই মান্দ্রাজের একখানি ডেক্‌টিকিট কিনিয়া জাহাজে উঠিলেন।

কয়েকদিন পরে তিনি মান্দ্রাজে পৌঁছিলেন। এ সেই সহর—যে সহরে ভারত-সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা ক্লাইভ্ প্রথমে কেরাণীর কার্য্য করিয়া পরে সৈনিক-কার্য্যে অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে তিনি নিজজীবনে বিরক্ত হইয়া গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! আজ হতাশাসাগরে ভাসিতে ভাসিতে সুরেশও সেই প্রাচীন ইংরেজ উপনিবেশ মান্দ্রাজ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এ সহরেও তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত; কেহ তাঁহাকে চিনে না, তিনিও কাহাকে চিনেন না। যাহা হউক, তিনি দিন কয়েক এখানে বাস করিবার

জন্য অতি সস্তায় একটি বাসা স্থির করিয়া লইলেন। সহরের অতি জঘন্য পল্লীতে এই বাসস্থান মিলিল এবং যে ক্ষুদ্র গৃহে তিনি বাস করিতে লাগিলেন, সেখানে শূকরও থাকিতে পারিত না! কিন্তু সুরেশের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু বোধ হয় আর জগতে বিরল, তিনি সহস্র কষ্টেও মুহ্যমান হইতেন না।

মান্দ্রাজে থাকিবার জন্য কোন প্রলোভন সুরেশের ছিল না। মান্দ্রাজে দেখিবার মত কিছুই নাই; তবে যদি কোন চাকুরী মিলে, এই আশায় তিনি মান্দ্রাজের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী আফিসে ঘুরিলেন; কিন্তু রেঙ্গুনে তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, এখানেও তাহাই হইল।—কোথাও কোন চাকুরী মিলিল না। বিশেষতঃ তিনি এদেশের ভাষা তামিল ও তেলিগু একেবারেই জানিতেন না। এভাষা যে তিনি মাসেক দুই মাসে শিখিতে সক্ষম হইবেন, এ সম্ভাবনা একেবারে ছিল না। কাজেই এখানে যে তাঁহার কোন চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা সহজেই বুঝিলেন। তবে খ্রীষ্টান পরিবারে কোন চাকুরী জুটিলেও জুটিতে পারে, এই আশায় তিনি কয়েক দিন মান্দ্রাজে থাকিয়া সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় সহিষ্ণু, তাঁহার এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য সহিষ্ণুতাবলেই তিনি এক্ষণে জগতে এরূপ খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেই সহিষ্ণুতার বলে তিনি মান্দ্রাজের প্রতি খ্রীষ্টান্ পরিবারের দ্বারে উপস্থিত হইয়া যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু কোথায়ও কোন কাজ জুটিল না। তিনি এমন কি, একটি বাড়ীও দেখিতে বাদ রাখিলেন না; মান্দ্রাজে যত খ্রীষ্টান্ পরিবার ছিল, তাহার প্রত্যেকের নিকট গেলেন, কিন্তু কোথায়ও কিছু হইল না। তিনি ক্রমে হতাশ

হইতে লাগিলেন, তাঁহার নিকট যে কয়টিমাত্র টাকা ছিল, তাহাও ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। শেষ কয়েক আনা পয়সামাত্র অবশিষ্ট আছে,—এই কয়টি পয়সা ব্যয় হইয়া গেলে তাঁহাকে এই বিদেশে অনাহারে রাজপথের ধারে পড়িয়া মরিতে হইবে! কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার তাঁহার আর উপায় নাই; তাঁহার জাহাজ ভাড়া নাই, খাটিয়া কোন চাকুরী করিয়া জাহাজ-ভাড়া সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাঁহার আর দেশে ফিরিবার উপায় নাই! তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অনন্য-মনে সমুদ্রের তীরে আসিলেন। সম্মুখে নীল সমুদ্র ফেনমালায় ভূষিত হইয়া পর্ব্বতাকার তরঙ্গে গড়াইতে গড়াইতে বেলাভূমে আসিয়া পড়িতেছে;—সুরেশ জীবনে হতাশ হইয়াছেন, সমুদ্রের এই ভীম-ভাব তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "জীবনে আর প্রয়োজন কি? এত কষ্ট পাইয়া কষ্টের জীবন রাখায় লাভ কি? এই ত সম্মুখে সমুদ্র নাচিতেছে। লাফাইয়া ইহার সুশীতল গর্ভে পতিত হইলেই ত সকল জ্বালা জুড়ায়।" কতবার তিনি এই ভাব মন হইতে দূর করিলেন, তিনি সমুদ্রের নিকট হইতে দূরে গমন করিলেন; কিন্তু আবার সেই ভাব মনে আসিল, আবার কে যেন তাঁহাকে সমুদ্রের নিকট আনিল। তিনি নৈরাশ্য ও বিবেকের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। প্রাণের ভিতর কে যেন তাঁহাকে বলিতেছিল, "সুরেশ মরিও না। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

এইরূপ নানা চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া সুরেশ ধীরে ধীরে হতাশ-ভাবে সমুদ্র-তীরে পদচারণা করিতেছিলেন। তাঁহার সাহেবী পোষাক পরিহিত ছিল; কিন্তু সে পরিচ্ছদের অবস্থা এমনই হইয়াছে যে, তাহা দেখিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি অতি শোচনীয়

অবস্থায় উপনীত! তাঁহার পাদুকা ছিন্ন, সার্ট ময়লা, কোট ছেঁড়া, পেণ্ট্‌লেনে তালি দেওয়া, তাঁহার সোলা-হাট্‌ ধূলায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার চেহারা ও বেশ দেখিলে অপরিচিত লোকে যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে কোন কাজ দিবে বা তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা অতি অল্প!

সমুদ্রতীরে সাহেবের মেয়েছেলেরা নাচিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল;—তাহাদের দেখিয়া সুরেশের নাথপুরের কথা মনে পড়িল। কত সুখে বাল্যকালে তিনি নাথপুরে খেলা করিয়া বেড়াইতেন;—আর আজ বিদেশে-বিভূমে মান্দ্রাজ-উপকূলে তাঁহার কি দুর্দ্দশা! সহসা তাঁহার জননীর স্নেহমাখা মুখ মনে উদিত হইল। না জানি, তাঁহার এইরূপ নিরুদ্দেশে তিনি কত কষ্টে কাল কাটাইতেছেন! না জানি, তিনি কত কাঁদিতেছেন, কত কষ্ট পাইতেছেন! হায়, তিনি দূর মান্দ্রাজে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত;—তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না! এই সকল চিন্তায় সুরেশ উন্মত্তপ্রায় হইলেন। হয় ত তিনি আত্মহত্যা করিতেন। এইরূপ সময় সহসা তাঁহার দৃষ্টি এক ব্যক্তির প্রতি পড়িল;— অমনি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি এই ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে ব্যগ্র হইলেন।

ইনি একটি বৃদ্ধ পাদরী সাহেব। ইহার সমস্ত কেশ ও লম্বমান শ্মশ্রু শ্বেত হইয়া গিয়াছে। অতি সৌম্যমূর্ত্তি, দেখিলে ভক্তি হয়। দেখিলেই বোধ হয় ইনি শান্তির কোলে বিরাম লাভ করিতেছেন। সুরেশ ইঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মস্তকস্থ টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিলেন; সাহেব তাঁহাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমি কি তোমার কোন সাহায্য করিতে পারি?" সুরেশ বলিলেন, "আমি বিদেশী।"

সাহেব। তোমার চেহারা দেখিয়া তা স্পষ্ট বুঝা যায়। মান্দ্রাজে কি জন্য আসিয়াছ?

সুরেশ। কোন চাকুরী পাইবার আশায় এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু যদিও আমি সর্ব্বত্র চেষ্টা করিয়াছি, তবুও কোথাও কিছু যোগাড় করিতে পারি নাই।

সাহেব। সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, চাকুরী পাওয়া এখন বড়ই কঠিন। আমি বৃদ্ধ হইয়া কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছি, আমি যে তোমাকে কোন সাহায্য করিতে পারিব, এরূপ বোধ হয় না।

সুরেশ। মহাশয়! আমি প্রায় অনাহারে আছি; আমার নিকট যে অর্থ আছে, তাহাতে কা'ল আমি একখানি রুটী কিনিতে সক্ষম হইব না।

সাহেব। তুমি দেশে যাও না কেন?

সুরেশ। আমার দেশ কলিকাতা।

সাহেব। কলিকাতা ছেড়ে মান্দ্রাজে এলে কেন?

সুরেশ। আমি কলিকাতায় স্পেন্সেস্ হোটেলে চাকুরী করিতাম, সেখান হইতে রেঙ্গুনে যাই। সেখানে কোন চাকুরী যোগাড় করিতে না পারিয়া মান্দ্রাজে আসি। এখানেও কিছুই জোগাড় করিতে পারিতেছি না।

সাহেব। এখানে যে কেহ তোমায় সাহায্য করিবে, এমন বোধ হয় না।

সুরেশ। তা আমি বুঝিয়াছি। এক্ষণে আমাকে অনাহারে মরিতে হইবে।

সাহেব। কতদূর লেখা-পড়া করিয়াছ?

সুরেশ। লণ্ডন্ মিশন কলেজে এণ্ট্রান্স্ ক্লাশ পর্য্যন্ত লেখা-পড়া করিয়াছি। কিছু কিছু ইংরাজী ও বাঙ্গালা জানি মাত্র।

সাহেব। তুমি কি খ্রীষ্টান্ ?

স্থরেশ। হাঁ মহাশয়! য়্যাষ্টন্ সাহেব আমাকে খ্রীষ্টান্ করেন।

বৃদ্ধ সাহেব কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাঁহারা উভয়েই কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলেন। যদিও স্থরেশ সাহেবকে আরও অনেক কথা বলিতে ইচ্ছুক, কিন্তু মনের সে ইচ্ছা মনেই রাখিলেন, সাহেবকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সাহেব বলিলেন, "তুমি কি কাজ করিতে পার, মনে কর ?"

স্থরেশ। যাতে আমি বাড়ী ফিরে যাবার ভাড়া সংগ্রহ করিতে পারি, আর প্রত্যহ একমুঠা খেতে পাই, সেই কাজ আমি করিতে সক্ষম।

সাহেব। বেড়াইবার সখ মিটেছে? বাড়ীর চেয়ে স্থান নাই!

আবার সাহেব বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন;—পরে স্থরেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি দুটি ছেলেকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারো ?" আমি উপস্থিত তোমাকে অন্য কোন কাজ দিতে পারি না। অন্য কোন কাজ হাতে নাই। আমি তোমাকে চিনি না, কাজেই আমি তোমার জন্য অন্যত্র অনুরোধ করিতে পারি না। দিন কতক গেলে তোমাকে দেখিলে শুনিলে, হয় ত তোমাকে আমি অন্য কোন ভাল কাজ জোগাড় করিয়া দিতে পারিব।

স্থরেশ। মহাশয়! আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমার নাই।

স্থরেশ সাহেবের সহিত তাঁহার বাড়ী গমন করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি বৃদ্ধ-সাহেবের দুটি শিশু পৌত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। স্থরেশ শীঘ্রই সকলের প্রিয় হইতে পারিতেন; এখানেও অতি শীঘ্র সাহেব ও মেমদিগের প্রিয়পাত্র হইলেন।

এই পরিবারে স্বরেশ কয়েকমাস রহিলেন। যখন তাঁহার কলিকাতা যাইবার ভাড়া ও সেখানে গিয়া কিছুদিন থাকিবার খরচ সংগ্রহ হইল, তখন তিনি বৃদ্ধ-সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চলিলেন। তখন স্বরেশ ষোড়শবর্ষদেশীয় তরলমতি বালক মাত্র।

---

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

## আবার কলিকাতায় স্বরেশ

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া স্বরেশ কোন পাকা চাকুরী যোগাড় করিতে পারিলেন না। যখন যাহা জুটিতে লাগিল, তখন তাহাই করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র চেষ্টায় রহিলেন। তাঁহার সময় তখন মন্দ,— তিনি শত-চেষ্টায়ও কোন ভাল চাকুরী পাইলেন না। তবে তাঁহার অনাহারের কষ্ট ছিল না। য়্যাষ্টন্ সাহেব তাঁহাকে সর্ব্বদা অবাধে লণ্ডন্-মিশন্ বোর্ডিংএ বাস করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি ইচ্ছামত সেইখানেই বাস করিতে ও ভোজন করিতে পাইতেন, তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না। তবে ভোজন ও বাসের সংস্থান হইলেও লোকের নিজ-খরচের জন্য দুই চারি টাকার আবশ্যক হয়; স্বরেশের এক্ষণে তাহারই অভাব।

মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একদিন বাটীতে, যখন তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত ও অন্যান্য পুরুষগণ অনুপস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে

মায়ের সহিত স্বাক্ষাৎকার করিলেন। তাঁহার জননী কাহাকে কিছু না বলিয়া তাঁহাকে কয়েকটী টাকা দিলেন। তিনি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলিলেন যতদিন না কোন চাকুরী হয়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি তাঁহাকে কিছু কিছু টাকা দিবেন; কিন্তু সুরেশের জননীর সহিত সাক্ষাৎকার করা প্রায়ই ঘটিত না।

এক্ষণে সুরেশের স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংসারে বিপদাপদের অপেক্ষা স্বভাবকে নরম করিবার আর উৎকৃষ্টতর যন্ত্র কিছুই নাই। সংসার-সমুদ্রের মহাতরঙ্গে পতিত হইয়া সুরেশেরও ঔদ্ধত্য লোপ পাইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লেখা-পড়ার উন্নতি না করিলে সংসারে বড় হইবার কোন আশা নাই। এক্ষণে পড়া-শুনা করিবার জন্য তাঁহার যথেষ্ট সময় ছিল, কিন্তু পুস্তকে বহুক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব! তবে দেখিয়া শুনিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে একটু লেখা-পড়ার উন্নতি করা একান্ত আবশ্যক,—তাহাই এক্ষণে তিনি সময় পাইলেই কোন না কোন পুস্তক পাঠ করিতেন। তিনি উপন্যাস পাঠে বড় ভক্ত ছিলেন না,—যে সকল পুস্তকে নূতন নূতন দেশের বর্ণনা আছে, নূতন নূতন শিখিবার বিষয় আছে, তিনি সেই সকল পুস্তকই পাঠ করিতেন।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার লেখা-পড়ার উন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার জীবনের একমাত্র আসা এখনও দূর হয় নাই। এখনও তিনি দিনরাত বিলাত যাইবার উপায় উদ্ভাবনা করিয়া থাকেন; মনে মনে এ সম্বন্ধে কত গড়েন ভাঙ্গেন, ইহার জন্য কত লোকের নিকট গমন করেন, কিন্তু কোন স্থানেই কিছু করিতে পারেন না! তিনি তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখিলেন না। সময় পাইলেই তিনি গঙ্গার তীরে জেটিতে জেটিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সুবিধা

হইলেই সেলার্সহোমে গিয়া জাহাজী গোরাদিগকে একটু সুরাপান করাইয়া তাহাদের মুখে সমুদ্রের কথা, বিপদ্‌-আপদের কথা, নানাদেশের কথা শুনিতেন। যতই তিনি এই সকল শুনিতেন, ততই তাঁহার বিলাত দেখিবার জন্য মন পাগল হইয়া উঠিত। যদি জাহাজের গোরা হইয়াও বিলাত যাইতে হয়, তাহাও যাইবেন—যেন তেন উপায়ে যাওয়াই চাই। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল ফার্ম্মের জাহাজ আছে, সেই সকল স্থানে গমন করিয়া নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন,—কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যাঁহাদের নিকট গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিলেন, কেহ কেহ বা বিরক্ত হইয়া রূঢ়ভাবে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু সুরেশ তবুও আশা ছাড়িলেন না; তিনি হতাশ হইবার পাত্র ছিলেন না।

---

# বিংশ পরিচ্ছেদ

## স্বদেশকে বিদায়

এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, সুরেশের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা সেইরূপ সুদুর-পরাহতই রহিল। যখন এইরূপে হতাশ-চিত্তে কলিকাতার রাজপথে তিনি ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে বি, এস্, এন্, কোংর একখানি জাহাজের কাপ্তেন্ সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কাপ্তেন্ সাহেবের জাহাজ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে; মাল নাবান, মাল বোঝাই করা, জাহাজ রঙ্গ করা প্রভৃতিতে জাহাজ প্রায় মাসাধিকের

উপর কলিকাতায় থাকিবে। কাপ্তেন্ সাহেব নিতান্ত দয়াবান্ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন;—ভারতবাসীর প্রতি বিন্দুমাত্র তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না। তাঁহার নিকট তিনিও যেরূপ মানুষ, সুরেশও সেইরূপ মানুষ;—বিশেষতঃ সুরেশ তাঁহার স্বদেশীর ভাষায় তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে পারেন, ইহাতে তিনি সুরেশের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। যদি তাঁহার দ্বারা সুরেশের কোন উপকার হয়, তাহা তিনি আনন্দের সহিত করিবেন বলিয়া সুরেশকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া বিদায় হইলেন।

সুরেশ কাপ্তেন্ সাহেবের জাহাজের নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন; সেই দিন হইতে তিনি প্রত্যহ জাহাজে গিয়া কাপ্তেন্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এরূপ যাওয়া আসায় উভয়ের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল; সাহেব পুত্র-নির্ব্বিশেষে সুরেশকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। প্রথমে সুরেশ কাপ্তেন্ সাহেবকে নিজের মনের কথা কিছু প্রকাশ করেন নাই; পরে একদিন তিনি নিজের সমস্ত অবস্থা জানাইয়া প্রাণের ইচ্ছা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। এত অল্প-বয়সে যে তিনি দেশ-ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করেন, এ প্রস্তাবে সাহেব অনুমোদন করিলেন না। পরে সুরেশের অনুনয়-বিনয়ে তিনি সুরেশকে লণ্ডন লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি সুরেশকে তাঁহার জাহাজের আসিষ্টাণ্ট্‌ষ্টুয়ার্ডের পদে নিযুক্ত করিলেন।

কয়েক দিন পরেই জাহাজ কলিকাতা ছাড়িয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে চলিল। বালক সুরেশ;—কারণ, তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসরের উর্দ্ধ নহে,—ব্যাকুল-নেত্রে জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া একবার শেষ কলিকাতা দেখিয়া লইলেন। জাহাজ ছাড়িয়া যাইতেছে, দেখিবার জন্য অনেক লোক গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়াছে;—কিন্তু তাহাদের মধ্যে সুরেশের আপনার বলিবার কেহই ছিল না। তিনি যে জন্মের মত

স্বদেশ, স্বজন, জনক-জননী সকল পরিত্যাগ করিয়া দূর বিদেশে প্রস্থান করিতেছেন, তাহা কেহ জানিল না, দেখিল না, কেহ তাঁহার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল না।

সে সময়ে সুরেশের প্রাণের যে কি অবস্থা, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কি করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। তিনি দূর বিদেশে বিদেশীর মধ্যে যাইতেছেন, তাঁহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে! স্নেহময়ী জননীকে কাঁদাইয়া তিনি চিরদিনের জন্য চলিলেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয় ছিন্ন হইতে লাগিল! তিনি কতবার ভাবিলেন,—এখনও সময় আছে, কাপ্তেন সাহেবকে বলিয়া ডেঙ্গায় নামিয়া পড়ি;—আর বিলাত দেখিয়া কাজ নাই। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে শমিত করিলেন;—চক্ষের জল চক্ষে মুছিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জন্মভূমির নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন!

এরূপভাবে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া তিনি জন্মভূমিকে যে শেষ দেখা দেখিবেন, এক্ষণে সুরেশের সে অবস্থাও নাই। তিনি জাহাজে চাকুরী লইয়াছেন, জাহাজের চাকর;—তাঁহার শত-কার্য্য করিবার আছে;—তিনি এরূপভাবে থাকিলে চলিবে কেন? জাহাজের কাপ্তেন্ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণই বা তাঁহাকে ইহা করিতে দিবেন কেন? রুমালে মুখ মুছিয়া, হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে লুকাইয়া, সুরেশ জাহাজের যে স্থানে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে, সেই স্থানে গমন করিলেন।

---

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

## সমুদ্র-পথে সুরেশ

যে জাহাজে সুরেশ চাকুরী লইয়া চলিলেন, সেই জাহাজে অনেক সাহেব মেম যাইতেছিল। সাহেবদিগের মধ্যে কতকগুলি সওদাগর, কতকগুলি চাকুরে; মেমদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বামি-সমভিব্যাহারে দেশে যাইতেছিলেন, কেহ কেহ বা স্বাস্থ্যের জন্য, কেহ কেহ বা দেশ বেড়াইবার জন্য চলিয়াছেন।

জাহাজের নাবিকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ; জনকয়েক দেশী খালাসী আছে। সুরেশ কোনমতেই এই সকল লোকের সহিত মিশিতে পারেন না! যে সকল ইংরাজ নাবিক ছিল, সুরেশ প্রথম প্রথম তাহাদের সহিতও মিশিতে পারিলেন না। তিনি অ্যাসিষ্টাণ্ট্ ষ্টুয়ার্ডের পদ পাইয়াছেন, ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট নহে; তবে তিনি কাপ্তেন্ সাহেবের প্রিয়পাত্র, কাপ্তেনের ভয়ে কেহ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে সাহস পাইত না। কাহারও সহিত মিশিতে না পারিয়া, কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাইয়া, বহুসংখ্যক লোক জাহাজে থাকা সত্ত্বেও তিনি যেন একাকী; এরূপ অবস্থায় সুরেশ বড়ই কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি এরূপে দেশ ছাড়িয়া আসিয়া ভাল করেন নাই, মনে মনে ইহা ভাবিয়া সময় সময় অনুতপ্ত হইতেন; কিন্তু তিনি প্রথমে তাঁহার জীবন যেরূপ দুঃখময় ভাবিয়াছিলেন, কয়েকদিন পরে দেখিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আরোহীদিগের নিকট তাঁহার

চাকুরীর খাতিরে নানা-কার্য্যের জন্য যাইতে হইত। আরোহীদিগের পরিচর্য্যা করাই তাঁহার চাকুরীর প্রধান কার্য্য। কাজেই প্রায়ই তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। অনেক আরোহী তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে চাকরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, প্রায়ই তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না; কিন্তু অনেকে তাঁহার বয়স অল্প, পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, হাবভাব ভদ্রলোকের ন্যায়, তাঁহার ইংরাজি-কথা ইংরাজের ন্যায় দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন; কয়েকজন মেমও তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মেমেরা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে উৎসুক হইতেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াও বিশেষ আমোদ লাভ করিতেন। সাহেবদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহাকে দেশীয় বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। যদিও তাঁহারা সুরেশকে সদ্বংশজাত বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে খালাসী খানসামার জাতি মনে করিতেন, তবুও তাঁহাকে নিতান্ত চাকরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। সুরেশ প্রথমে জাহাজে কয়দিন যেরূপ মানসিক ক্লেশ বোধ করিয়াছিলেন, পরে তৎ-পরিবর্ত্তে বরং বিশেষ আমোদ ও সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এতদিনে তাঁহার জীবনের আশা মিটিতে চলিল। তিনি ক্রমেই লণ্ডনের নিকটস্থ হইতেছেন। যে বিলাত দেখিবার জন্য তিনি কয়েক বৎসর উন্মাদের ন্যায় কলিকাতার রাজপথে ঘুরিতে ছিলেন, সেই বিলাত আর কয়েকদিনের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইবেন। সেই বিলাতের রাজপথে তিনি বেড়াইতে পারিবেন। এ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাণ-মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ভাবিলেন, জাহাজস্থ সাহেব মেমগণ যখন তাঁহাকে এত যত্ন করিলেন, তাঁহারা যখন তাঁহার সহিত এত সদ্ব্যবহার করিলেন, তখন তিনি অনায়াসেই বিলাতে একটা চাকুরী যোগাড় করিতে

পারিবেন। হয় ত কোনও সদাশয় ইংরাজ তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিতে পারেন। এই সকল সুখের চিন্তায় সুরেশ বড়ই সুখে দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার সহকারিগণ এবং নাবিকগণ প্রথমে তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার না করিলেও পরে তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে আদর যত্ন করিতেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকলেই চেষ্টা পাইতেন। ইংরাজ নাবিকগণের ন্যায় মন-খোলা লোক সংসারে আর নাই, ইহারা সকলের সঙ্গেই মিশামিশি করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে। সুরেশ ইহাদের সহিত জাহাজে প্রকৃতই বড় সুখে ছিলেন।

জাহাজে পথে কোন বাধা-বিপত্তি ঘটিল না। ক্রমে নিরাপদে জাহাজ লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আরোহিগণ স্বদেশে পৌছিয়া কালবিলম্ব না করিয়া সকলে ব্যগ্র হইয়া জাহাজ হইতে নামিয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। সুরেশ জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া জগতের শ্রেষ্ঠ সহর লণ্ডন-নগরের দিকে বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

---

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

### লণ্ডনে সুরেশ

জাহাজ টেম্‌স্‌নদীর তীরস্থ লণ্ডন মহানগরীর পার্শ্বে আসিয়া লাগিল আরোহিগণ নিজ নিজ মালামাল লইয়া ব্যস্ত হইলেন। নাবিকগণ জাহা[জ] নঙ্গর করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কস্‌টম্ আফিসে[র] কর্ম্মচারিগণ আসিয়া সকলের বাক্স-প্যাটরা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন

যে সকল দ্রব্য মাশুল-ব্যতীত বিলাতে লইয়া যাওয়া যায় না, নাবিকগণ বা আরোহিগণ কেহ লুকাইয়া তাহা আনিয়াছে কি না, ইঁহারা তাহাই দেখিতে প্রবৃত্ত; জাহাজের উপর হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকেই লোক ছুটাছুটি করিতেছে।

আরোহিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা জাহাজের উপর আসিয়াছেন,—চারিদিকেই হস্ত-আলোড়ন, সকলেরই মুখে হাসি। বহু-দিন পরে হয় ত স্বামী স্ত্রীকে দেখিতেছেন, জননী পুত্র-কন্যার মুখ-চুম্বন করিতেছেন, পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইতেছেন। এই দৃশ্য সুরেশ জাহাজের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার কড়েয়ার ও নাথপুরের বাড়ীর কথা মনে হইতেছিল, স্নেহময়ী জননীর মুখ মনে পড়িতেছিল;—আর কি কখন মায়ের সহিত দেখা হইবে; আর কি কখনও দেশে ফিরিতে পারিবেন না!

সম্মুখে সুরেশ যে দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তেমন তিনি স্বপ্নেও কখনও উপলব্ধি করেন নাই। যে সাহেবদের ভারতবাসী দেবলোকবাসী দেবতা মনে করিয়া থাকে;—এখানে সেই সাহেবদিগের ছড়াছড়ি। মুটে সাহেব, গাড়োয়ান সাহেব;—চাকর নকর সকলই সাহেব;—যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর সাদা-মুখ; কাল-লোক একটিও নজরে আইসে না। লণ্ডন-সহরই বা কি ভয়ানক-ব্যাপার;—বর্ণনা হয় না। হাজার হাজার সাহেব রাজপথে ছুটিতেছেন;—পদ্মফুলকে লজ্জা দিয়া মেয়েরা নানা সাজে যাইতেছেন;—কত গাড়ী, কত ঘোড়া কত জাহাজ, কত নৌকা;—সুরেশ ভারতের প্রধান-সহর কলিকাতাবাসী;—কিন্তু লণ্ডন দেখিয়া তাঁহার কলিকাতাকে নগণ্য সামান্য গ্রাম বলিয়া প্রতীতি জন্মিল।—তিনি কোন্ দিকে কি দেখিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল;—তিনি হতভম্বের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া একদিকে চাহিয়া রহিলেন।

কেহ তাঁহাকে দেখিতেছিল না ;—কেহ তাঁহার সংবাদ লইতেছিল না ;—আরোহিগণ ব্যগ্রভাবে মালামাল লইয়া আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া যাইতেছেন। নাবিকগণ জাহাজকে সুদৃঢ়রূপে নঙ্গরবদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল ; সুরেশের সংবাদ লইবার তাহাদের অবসর ছিল না। জাহাজ বন্দরে আসিয়াছে, হিসাবপত্র সমস্তই জাহাজ-স্বামীকে দিতে হইবে, সেই সকল কাগজপত্র লইয়া কাপ্তেন-সাহেব ব্যস্ত ;—তাঁহারও সুরেশের সংবাদ লইবার অবসর নাই। এই জনাকীর্ণ জাহাজের উপর সুরেশ মনে করিতেছিলেন, তাঁহাপেক্ষা একাকী বোধ হয় জগতে আর কেহ নাই। তাঁহার বোধ হইল, এ সংসারে তাঁহাপেক্ষা দুঃখীও বোধ হয় আর কেহ নাই! তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল!

এই সময়ে কে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিল, তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন, দেখিলেন, আরোহীদিগের মধ্যস্থ একটি মেম, ইনি প্রৌঢ়াবয়স্থা ;—স্বামী-সন্ধানে ভারতে গিয়া ভারতের সহরে সহরে ফিরিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই ; যৌবন প্রায় অতীত, অর্থও তত নাই, এরূপ অবস্থায় স্বামী-লাভ বড় সহজ নহে ; এক্ষণে তিনি গৃহে ফিরিতেছেন। জাহাজে তিনি আত্মীয়-স্বজন-বর্জ্জিত বালক সুরেশকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন ; এক্ষণে জাহাজ হইতে যাইবার সময় সুরেশকে দুইটি মিষ্টকথা না বলিয়া যাইতে পারিলেন না।

যখন জাহাজ হইতে আরোহিগণ সমস্ত চলিয়া গেলেন,—গোলমাল কতক দূর হইল,—তখন কাপ্তেন সাহেব সুরেশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুরেশ নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি করিতে চাও? আবার যে চাকুরীতে আসিয়াছ, সেই চাকুরীতে জাহাজে যাইতে চাও ;—না লণ্ডনে থাকিতে চাও?"

সুরেশ বলিলেন, "আমি এখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই। কি করিব, এখনও ভাবিবার সময় পাই নাই।"

কাপ্তেন্। বেশ, ভেবে চিন্তে যা ভাল বিবেচনা কর, ঠিক কর। তবে আমার দ্বারা যেটুকু হয়, আমি সর্ব্বদাই তোমার জন্য করিতে প্রস্তুত আছি। যতদিন জাহাজ এখানে আছে, ততদিন তুমি জাহাজে থাকিতে পার;—জাহাজ প্রায় তিন সপ্তাহ এখানে থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে তুমি লণ্ডনের সকলই দেখিয়া লইতে পার।"

সুরেশ। মহাশয়! আপনাকে কিরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিব জানি না। আমার পিতা যাহা কখন আমার জন্য করেন নাই, আপনি আমার জন্য তাহা করিয়াছেন। যতদিন দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন আমি আপনার নিকট কেনা হইয়া রহিলাম।

কাপ্তেন্ সাহেব উচ্চহাস্য করিয়া সস্নেহে সুরেশের পৃষ্ঠে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "তোমার ধন্যবাদ আমি চাই না। তোমার ভাল হইলেই আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব। ভবিষ্যতে তোমার ভাল হইয়াছে শুনিলে, আমি প্রকৃতই সুখী হইব। যদি আমার পরামর্শ শোন, তবে এখন তুমি তোমার মাহিনার টাকা লইও না। এখন তুমি জাহাজে থাকিবে, সুতরাং তোমার এক পয়সাও খরচ লাগিবে না। যখন আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব, যখন তুমি একাকী লণ্ডনে পড়িবে, যখন তোমাকে লণ্ডনে বাস করিতে হইবে, তখন তোমার অনেক টাকার দরকার হইবে। যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া নিজের নিকট রাখিতে পার, তাহাই বিশেষ উপকারে লাগিবে; কারণ এ সহরে একগাছি ঘাস পর্য্যন্তও বিনা-মূল্যে পাইবে না।"

কাপ্তেন্ সাহেবের সস্নেহ-উপদেশে সুরেশের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না;—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। কাপ্তেন্ সাহেব বৃদ্ধ

হইয়াছিলেন, আজীবন জলে জলে নাবিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘুরিতে ছিলেন ;—কিন্তু তাঁহার প্রাণ ছিল ; সংসার-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গের কঠোর আঘাতেও তাঁহার হৃদয় কঠিন হয় নাই। সুরেশের চক্ষে জল দেখিয়া বৃদ্ধ কাপ্তেনের চক্ষুর্দ্বয়ও জলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল।

কাপ্তেন্ সাহেব সুরেশকে বিদায় দিয়া জাহাজ-স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্থান করিলেন। তখন জাহাজের বোসোয়েন্ অর্থাৎ সারেঙ্গ সাহেব সুরেশকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন সহর দেখাইতে বহির্গত হইলেন। লণ্ডন-নগরীতে পদস্থাপনা করিয়া সুরেশ সকল মানসিক কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। এতদিন পরে তাঁহার জীবনের সাধ পূর্ণ হইল। বাল্যকাল হইতে শয়নে স্বপনে তিনি যে আশাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, এতদিনে সে আশা পূর্ণ হইল!

---

# ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

## লণ্ডনে প্রথম রাত্রি

সুরেশ যাহা দেখিলেন, স্বপ্নে কখনও তাহা তিনি ভাবেন নাই! কি বিস্তৃত সহর, কি মনুষ্যের জনতা! কত গাড়ী-ঘোড়া! এরূপ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তিনি কখন দেখেন নাই,—এরূপ মনোমুগ্ধকর সুসজ্জিত দোকান যে কখন কোথাও আছে, তাহা তিনি কখনও মনে ভাবেন নাই। চারিদিকেই সাহেব-মেমের ভিড়, সকলেই যেন মহা-ব্যস্ত, সকলেই যেন কি গুরুতর কার্য্যে ধাবমান; দেখিলে বোধ হয় যেন, এ দেশে বুঝি কেহ বিনা-কাজে বসিয়া থাকিতে পায় না। এত সাহেবমেমও সুরেশ একত্রে কখন দেখেন নাই। এখানে

সাহেব-ভিক্ষুক টুপিহস্তে তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব-কোচ-ম্যান তাঁহাকে গাড়ী-ভাড়া লইবার জন্ত অনুরোধ করিতেছে! তিনি বাঙ্গালী, এখানে যে ভারতবর্ষের ন্যায় সাহেবগণ দেশীয় বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন না, বরং সকলেই তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণ করিতেছেন, এ সমস্তই স্থরেশের নিকট নূতন, অভূতপূর্ব; তিনি রাজপথে চলিবেন কি? প্রতি পদেই তিনি আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই চক্ষু থাকে, আর কোন দিকেই ফিরিতে চাহে না। তিনি একটি গ্যাসের স্তম্ভে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুলভাবে চাহিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গী পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহ্বান করা সত্ত্বেও তিনি অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তাঁহার সঙ্গী জাহাজের সারেঙ্গ বোসোয়েন্ কয়দিনমাত্র স্থলে বাস করিবার অবসর পাইয়াছেন, তিনি এ কয়দিন আমোদ-প্রমোদ করিতে ব্যাকুল, এরূপ একস্থানে দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিতে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তিনি জেদাজেদি করিয়া স্থরেশকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

সারেঙ্গ স্থরেশকে লণ্ডনের সর্ব্বজনবিদিত, সর্ব্বাপকৃষ্ট "ইষ্ট্-এণ্ড্" পল্লীতে লইয়া গেলেন। লণ্ডন-সহরের দরিদ্রগণের আবাস-স্থল ইষ্ট-এণ্ড, ইহার ন্তায় অপরিষ্কার স্থান ভারতবর্ষেও নাই। লণ্ডনের যত বদ্মাইস্ প্রভৃতির ইহাই বাসস্থান ও আড্ডা। পদে পদে মদের দোকান! রাস্তায় মাতালের হুড়াহুড়ি; এখানে যেরূপ দরিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ জগতে আর কুত্রাপি আছে কি না বলা যায় না। যেমন দারিদ্র্য প্রবল-প্রতাপে এখানে রাজত্ব করে, পাপও সেইরূপ সকল আকারে ঘোর-প্রতাপে এখানে বিরাজিত। অনাহারে প্রপীড়িত বালক-বালিকাগণ পথপার্শ্বস্থ নর্দ্দমায় কুকুর-শূকরের ন্তায় খেলা করিতেছে। অনাহারে ও অতি-পরিশ্রমে কঙ্কালাবশিষ্টা কত শত স্ত্রীলোক হতাশের মেঘে আবরিত হইয়া শূন্তমনে মধ্যে মধ্যে ঘুরিতেছে।

কার্য্যের অভাবে কার্য্যান্বেষী শ্রমজীবিগণ পথের পাশে মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া কথোপকথন করিতেছে,—প্রত্যেক মদের দোকান হইতে হাস্যধ্বনি, কলহের রব—ঘোর কোলাহল শ্রুত হইতেছে।

সুরেশ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। লণ্ডনে আর একটি ভাল-দৃশ্য যে আছে, তাহা তখন তাঁহার মনে হইল না। যে যেখানকার লোক, সে সেইখানেই যায়। সারেঙ্গ জাহাজী গোরা অর্থাৎ খালাসীর সর্দ্দার বা মাঝি মাত্র, ভদ্র-সমাজের ধার তিনি ধারেন না। যেখানে তাঁহার আলাপ-পরিচয়, সুরেশকে তিনি সেই স্থানে লইয়া গেলেন।

এইভাবে সুরেশ কয়েকদিন ধরিয়া লণ্ডন সহর দেখিয়া বেড়াইলেন যেখানে যাহা দেখিবার ছিল, সমস্ত দেখিলেন; বিস্তৃত লণ্ডনের রাস্তাঘাটও কতকটা চিনিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে জাহাজ হইতে সহর দেখিতে বাহির হইতেন, সমস্তদিন আর জাহাজে ফিরিবার সময় হইত না, সহরেই কোন স্থানে আহার করিয়া লইতেন। সন্ধ্যার পর জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এইরূপে কয়দিন কাটিয়া গেল, আর জাহাজ লণ্ডনে দুই একদিন মাত্র আছে,—এখন একটা বাসা না যোগাড় করিলে নহে। তাঁহার বন্ধু জাহাজের বোসোয়েন্ তাঁহার জন্য একটা বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। বাসা খুব সস্তায় বন্দোবস্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি যে ঘরটি পাইলেন, সেটি একটি ক্ষুদ্র-বাক্স বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকার এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাচীর, তাহার উপর কাগজমারা। বহুকালের ধূলি ও নানাবিধ দ্রব্য লাগিয়া এই কাগজ অভূতপূর্ব্ব বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গৃহে একখানা ভাঙ্গা চেয়ার ও ভাঙ্গা টেবিল আছে, একপাশে একটা অর্দ্ধ-ছিন্ন গদিও আছে।

বাড়ীতে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ বাস করে, সকলেই পাপের শেষ স্তরে

অবতীর্ণ হইয়াও যেন সন্তুষ্ট নহে। সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপ-কার্য্যেই যেন তাহাদের বিপুল আনন্দ। পুরুষদিগকে দেখিলে ভয় হয়, মারামারি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা ও সুবিধা পাইলেই মদ খাওয়াই যেন তাহাদের কার্য্য। লাল-মুখ মদে মদে যেন আরও লাল হইয়াছে। সকলেরই মুখের কোন না কোন স্থান কাটা, দাঙ্গা-হাঙ্গামের চিহ্ন বিরাজমান! পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকগণও ঘোর সুরাসক্ত, মদ পাইলে আর কিছুই চায় না। একটু মদের জন্য না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। ইহারা জোঁকের ন্যায় পুরুষদিগকে ধরিয়া আছে। যতক্ষণ যাহার নিকট এক কপর্দ্দক থাকে, ততক্ষণ ইহারা তাহাকে ছাড়ে না।

সুরেশ এই সকল নরনারীর মধ্যে আসিয়া কতকটা ভীত হইলেন। ইহাদের স্বভাব, প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার তাঁহার নিকট অতি বীভৎস ও ভয়াবহ বোধ হইল;—কিন্তু উপায় নাই! ভাল স্থানে বাস করিবার উপযুক্ত অর্থ তাঁহার ছিল না। প্রথম রাত্রিবাসেই সুরেশ বুঝিলেন যে, এ স্থানে তাঁহাকে কি বীভৎসপ্রকৃতি সহবাসিগণের মধ্যে কিরূপ অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। তাঁহার তখন বয়স ১৭ বৎসর মাত্র, তিনি শান্ত নিরীহপ্রকৃতি বাঙ্গালী;—তিনি যে এই সকল মাতাল, কলুষিতস্বভাব সাহেব-মেমদিগের মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার সাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি যে একেবারে পুণ্যাত্মা বা সুনীতির আদর্শ ছিলেন, তাহা নহে;—একটু আধটু কখন কখনও মদও খাইতেন, কিন্তু এই সকল নরনারীর অশ্লীল-বচন, বীভৎস-কার্য্য, লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল;—হৃদয় হৃদয়ে যেন বসিয়া গেল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যাহাই অদৃষ্টে থাকুক, এরূপ স্থানে থাকা হইবে না। কা'ল প্রাতেই অন্যত্র আর একটা বাসা করিতে হইবে।

নানাচিন্তায় তিনি একেবারেই কিছু আহার করিতে পারিলেন না; শুইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ,—এইরূপে শুইয়া সুরেশ আকাশ-পাতাল নানা ভাবনা ভাবিতেছেন—এরূপ সময়ে সহসা তাঁহার বোধ হইল যেন, ঘরটি আরও গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন, আর একজন কে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। বিদেশ, বিভূমি,—সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়, ভিন্ন-প্রকৃতির লোক-মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। কিরূপ ভয়ানক লোক এই বাটীতে বাস করে, তাহাও তিনি দেখিয়াছেন,—তাঁহার কপালে বড় বড় ঘাম দেখা দিল; কি একরূপ অভাবনীয় ভীতি ধীরে ধীরে যেন তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল,—এরূপ ভয়ের ভাব তাঁহার হৃদয়ে কখনও আসে নাই। কে তাঁহার গৃহে এত রাত্রে প্রবেশ করিল? কি উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছে? সম্ভবতঃ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার নিকট যাহা কিছু আছে, তাহাই লওয়া ইহার উদ্দেশ্য;—এইরূপ ভাব সুরেশের মনে আসিবামাত্র সুরেশ হৃদয় হইতে ভয়ের ভাব দূরীভূত করিলেন,—মরিতে তিনি কখনই ভীত ছিলেন না! যদি মরিতে হয়, তবে শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মরিব না;—লড়িয়া মরিব,—এই ভাবিয়া সুরেশ আপনার পকেটে যে বড় ছোরা ছিল, তাহাই ধীরে ধীরে বাহির করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, যেই হউক না কেন, তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না।

তাঁহার বোধ হইল, একটি লম্বা ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার বিছানার চারিদিকে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছে। সে যে কে, তাহা তিনি কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যাইতেছিল না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তিনি গলার শব্দ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, অমনি যেন সেই মূর্ত্তি বাতাসে মিলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া গৃহের চারিদিকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন,—কাহাকেও

কোথায় দেখিতে পাইলেন না। তখন পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া জ্বালিলেন, দেখিলেন গৃহে কেহই নাই। শয়নের পূর্ব্বে তিনি যেরূপ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ দ্বার রুদ্ধ আছে। তবে এ কে? এ কি ভূত? সুরেশ ভূত বিশ্বাস করিতেন না। ভূতের কথা মনে হইয়া মনে মনে হাসিলেন।

তিনি আবার শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে আর কিছুই ঘটিল না। অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি একটা ভাল বাসাবাটী ও কোন কাজের চেষ্টায় বহির্গত হইলেন। সমস্ত দিন নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কোন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যেখানে হাজার হাজার সাহেবমেম প্রত্যহ চাকুরীর জন্য হাহাকার করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে বিদেশী বাঙ্গালী বালক সুরেশ যে চাকুরী পাইবেন, এরূপ আশা করাই উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি বাসায় ফিরিলেন। তৃষ্ণার্ত্তও হইয়াছিলেন। একটু সুরাপান করিলে দেহে ও মনে বল পাইবেন ভাবিয়া তিনি যেখানে মদ বিক্রয় হয়, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। শত শত সাহেবমেম মদ খাইতে-ছিলেন,—কালো সুরেশকে দেখিয়া অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া কোন এক অদ্ভুত,দেশের অদ্ভুত-লোক ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। দুই জন মেম একস্থানে বসিয়া মদ খাইতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া সুরেশের সহিত আলাপ করিলেন;—তাঁহারা তাঁহাদের সহিত সুরেশকে সুরাপান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সুরেশ তাঁহাদের উপরোধ অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না; তাঁহাদের সহিত গৃহের একপার্শ্বে একটি টেবেলের পার্শ্বে বসিয়া সুরাপান আরম্ভ করিলেন।

শীঘ্রই সে বোতল শেষ হইল,—তখন সুরেশ আর এক বোতল হুকুম

করিলেন,—পরে আরও এক বোতল আসিল। বলা বাহুল্য, তখন সুরেশ ঘোর মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন ;—মেমদ্বয়ও তদনুরূপ,—তিন জনে কতই নৃত্য, কতই গীত,—কতই চীৎকার হইল ; শেষ রমণীদ্বয় আরও এক বোতল মদ সঙ্গে লইয়া সুরেশকে টানিতে টানিতে তাহারা যে গৃহে বাস করিত, সেইখানে লইয়া গেল।

তাহার পর কি হইল, সুরেশের মনে নাই! পরদিন প্রায় দুই প্রহরের সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ;—তখনও তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় নেশা। তিনি মাথা তুলিতে পারিতেছেন না ;—মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। দেখিলেন, পার্শ্বে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় মেমদ্বয় পড়িয়া আছে ;—গৃহের দ্রব্যাদি লণ্ডভণ্ড, মাতলামির চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারও অধঃপতনের শেষ হইয়া গিয়াছে!

তিনি রমণীদ্বয়কে জাগরিত করিবার জন্য তাঁহাদের অধরে চুম্বন করিলেন, তাহারাও চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল। আবার মদ আসিল—সে দিনও সেইরূপে কাটিল ; আবার মদ আসিল, তাহার পরদিনও সেইরূপে কাটিল ;—এ বিপদে সুরেশকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না! তাঁহাকে সদুপদেশ দেয় এমন কেহ আত্মীয় ছিল না! কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার যাহা কিছু অর্থ ছিল, সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গেল! তখন সেই রমণীদ্বয় তাঁহার নিকট আর এক পয়সাও নাই দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! অর্থ-শূন্য অবস্থায় সুরেশ লণ্ডনের রাজপথে দাঁড়াইলেন!

যখন তাঁহার নেশা ছুটিল, জ্ঞান আসিল, তখন অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল ; কিন্তু অনুতাপের আর সময় নাই। তাঁহার নিকট আর এক কপর্দ্দকও নাই,—তিনি আজ কি আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিবেন? এই বিদেশে তাঁহার কি অবস্থা হইবে? কাহার নিকট কোথায় যাইবেন? এ ভারতবর্ষ নহে যে, লোকের দ্বারে গেলে

লোকে একমুষ্টি ভিক্ষা দিবে? এ ইংরেজের দেশে, যাহারা ভিক্ষা করে, তাহাদিগকে কারাগারে দেওয়া হয়;—এখানে ভারতের ন্যায় অতিথি-সৎকার নাই! স্থরেশ উন্মত্তের ন্যায় লণ্ডনের রাজপথে বহির্গত হইলেন।

---

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

## খবরের কাগজ-বিক্রেতা স্থরেশ

কি করিবেন কোথায় যাইবেন, স্থরেশ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যে দিকে মন চলিল, সেই দিকে চলিলেন। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে লণ্ডনের বিখ্যাত উদ্যান হাইড্ পার্কে আসিলেন। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হইয়া হতাশ-চিত্তে তিনি একটি ঝোপের মধ্যস্থ বেঞ্চেতে বসিয়া পড়িলেন। তৎপরে ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার কূল না দেখিয়া বিষণ্ণচিত্তে সেই বেঞ্চের উপর শয়ন করিলেন। কখন্ কিরূপে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহার চক্ষে অধিষ্ঠিতা হইলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

সহাস্য হাস্যধ্বনিতে স্থরেশের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া, দেখিলেন, একটি ইংরাজ বালক, একটি কালো মানুষকে এইরূপে শায়িত দেখিয়া আমোদে আটখানা হইয়া হাসিতেছে! স্থরেশ প্রথমে উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে বালক তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে দেখিয়া স্থরেশের ক্রোধের উদ্রেক হইল,—বালক বোধ হয় স্থরেশের মনের ভাব বুঝিল,—বলিল, "ভায়া, কোন্ দেশ থেকে এখানে?"

বালকের বাল-সুলভ স্বভাবে স্থরেশের ক্রোধ দূর হইল, তিনি বলিলেন, "আমি দূর ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি।"

বালক। বাঘ আর সাপের দেশ ?

সুরেশ। হ্যাঁ।—যে দেশ আর্য্যজাতির সভ্যতার আকর।

বালক। তার কিছুই জানি না। সে ব্যাপারখানা কি ?

সুরেশ হাসিলেন। এ তো সামান্য সংবাদপত্র-বিক্রেতা বালক। ইংলণ্ডের যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা পর্য্যন্ত ভারতের বিষয়েই এত অজ্ঞ যে, তাঁহাদের ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় পাণ্ডিত্য দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না। সুরেশ হাসিয়া বলিলেন, "যখন এদেশের লোকে কাপড় পরিতে জানিত না, তখন আমাদের দেশ সভ্যতার উচ্চ-আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।"

বালক। আমি সে বিষয়ের ভাবনায় বড় ব্যস্ত নই। কি অভিপ্রায়ে তুমি এ দেশে ?

সুরেশ। আমি একটা চাকুরী লইয়া একখানা জাহাজে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছি ; কিন্তু এখন এখানে আমার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, পকেটে একটি পেনীও নাই যে, এক টুক্‌রা রুটী কিনিয়া খাই।

বালক কিয়ৎক্ষণ সুরেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কি কর্ব্বে স্থির করেছ ?" বালক এমনই ভাবে সুরেশকে এই প্রশ্ন করিল যে, সুরেশ তাহাকে সকল কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার অবস্থা সমস্তই তাহাকে খুলিয়া বলিলেন, সকল শুনিয়া বালক বলিল, "আলস্যে থাকিলে চলিবে না। এ দেশে নিজের অন্নের জন্য সকলেই পরিশ্রম করে ও সকলকেই করিতে হয়, অন্য উপায় নাই। কেহ কাহারও গলগ্রহ হয় না, হইতেও পায় না। তুমিও কেন পরিশ্রম কর না ?"

সুরেশ। আমি পরিশ্রম করিতে কাতর নহি, কিন্তু কাজ পাই কই ?

বালক। তুমি আমাকে হাসালে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-সহরে আবার

কাজের অভাব! এখানে যথেষ্ট কাজ আছে; তবে চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম চাই।

সুরেশ। এই কথা মনে ভাবিয়াই আমি দেশ ছাড়িয়া এ দেশে আসিয়াছিলাম; কিন্তু এখানে এসে সবই উল্টা দেখিতেছি। বিদেশী লোকের এখানে কোন কাজ পাইবার সম্ভাবনা কিছুই নাই।

বালক। আমি রাজার হালে নাই, তবে অনাহারেও মরিতেছি না। যদি আমি অনাহারে না থাকি, তবে তুমিই বা কেন থাকিবে, তাহা জানি না।

সুরেশ। তুমি খবরের কাগজ বিক্রয় করিয়া দুপয়সা পাও; আমি বিদেশী, অপরিচিত, কোন্ কাগজওয়ালা আমাকে বিশ্বাস করিয়া কাগজ বিক্রয় করিতে দিবে?

বালক। যদি তুমি কাগজ বেচ্‌তে চাও ত, হয় ত আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে সাহায্য কর্ত্তে পারি।

সুরেশ। যদি তুমি আমার এ উপকার কর, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। যে কোন কাজই হউক না কেন, আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

বালক। ধন্যবাদের পাত্র আমরা নই। আমাদের কাগজের ম্যানেজারের নিকট চল, বোধ হয়, তিনি তোমাকে কাজ দিলেও দিতে পারেন।

সুরেশ বালককে ধন্যবাদ দিয়া তাহার সঙ্গে খবরের কাগজের আফিসে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ ম্যানেজার সাহেব কোন আপত্তি করিলেন না, সুরেশকে কাগজ-বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত করিলেন। সুরেশ বাহিরে আসিয়া কোথায় বাসা লইবেন, তাহাই ভাবিলেন—সে বাসায় তাঁহার যাইবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাঁহার মনের কথা বালককে বলায় সে বলিল, "যদি

তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমি যে ঘরে থাকি, তুমিও সেই ঘরে আমার সঙ্গে একত্রে থাকিতে পার।”

কোন কাজেই সুরেশ অধিকদিন মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিত না। এককাজ অনেক দিন তাঁহার ভাল লাগিত না। কাজেই সংবাদ-পত্র-বিক্রয় কাজও তাঁহার অধিক দিন ভাল লাগিল না। তিনি এ কাজে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন,—তাঁহাকে বিদেশী দেখিয়া অনেকে তাঁহার নিকট হইতেই সংবাদপত্র ক্রয় করিতেন। তিনি ভারতবাসী শুনিলে গ্রাহকগণ অন্যের নিকট কাগজ না লইয়া তাঁহারই নিকট হইতে লইতেন। এইরূপে সুরেশ অন্যান্য সংবাদপত্র-বিক্রেতা বালকগণ যাহা প্রত্যহ উপার্জ্জন করিত, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণে উচ্চ আশা সর্ব্বদা জাগরিত—তিনি সংসারসমুদ্রের গভীর-জলে নিমগ্ন হইয়াছেন,—সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এক্ষণে লণ্ডনের রাজপথে সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন,—অবস্থার হীনতা যতদূর হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি আশা ছাড়ে নাই।

সংবাদপত্র-বিক্রয় আর ভাল না লাগায় তিনি এ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তার পর কয়েকদিন অতি কষ্টে কাটাইলেন। যখন সংবাদপত্র বিক্রয় করিতেন, তখন তাঁহার আহারের ক্লেশ ছিল না, এক্ষণে তাহা দেখা দিল। কোন দিন কিছু আহার জুটিত, কোন দিন একেবারেই কিছু জুটিত না। এ সময়ে তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজও ছিল না,—যখন যে দিন যাহা জুটিত, তখন তাহা করিয়া দুই এক শিলিং উপার্জ্জন করিতেন এবং অতি কষ্টে সে দিনটা কাটাইয়া দিতেন। এই সময়ে তিনি অনুসন্ধান করিয়া য়াষ্টন্ সাহেবের জনক-জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অতি সাদরে অভ্যর্থন করিয়াছিলেন।

মধ্যে মধ্যে তাঁহারা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। যাহাতে তাঁহার কোন একটা কাজের সুবিধা হয়, তাহার জন্য বিশেষ যত্নও পাইয়াছিলেন,—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারাও সুরেশের কোন কাজ যোগাড় করিয়া দিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। অনাহার মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। বাড়ী-ওয়ালা ভাড়া না পাইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এ ভারতবর্ষ নহে যে, গৃহ না থাকিলে গাছতলায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাটিবে, ২।৪ পয়সা হইলে একরূপে দিন কাটিয়া যাইবে। লণ্ডন সেরূপ স্থান নহে। তথায় কঠোর শীতের তাড়নায় কেহ ঘরের বাহিরে রাত্রিযাপন করিতে পারে না; বাহিরে এক মুহূর্ত্তও থাকিবার যো নাই, অবিশ্রান্তভাবে বরফ পড়িতেছে। গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলে তিনি কোথায় গিয়া বাস করিবেন? আশ্রয়শূন্য হইলে শীতে ও বরফে লণ্ডনের রাজপথে তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে!

তিনি অর্থের জন্য বাড়ীতে পত্র লিখিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভুলিয়াছে। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের বিশ্বাস, তিনি আর জীবিত নাই! তাঁহার পিতা বা খুল্লতাত কেহই তাঁহার পত্রের উত্তর দিলেন না। দেশ হইতে এক পয়সাও পাইবার আশা তাঁহার রহিল না। তিনি কি করি-বেন,—কিরূপে কোন কাজ সংগ্রহ করিবেন! শেষে কি লণ্ডনের পাপ-সাগরে পাপে ডুবিবেন? উদরান্নের জন্য কি চুরি-জুয়াচুরি প্রভৃতিও করিতে হইবে! ঘোর বিপদে পড়িয়া পেটের দায়ে হয়ত সুরেশকে মহাপাপে নিমগ্ন হইতে হইত; কিন্তু যিনি পদে পদে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি এবারও তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

একদিন রাত্রে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, গৃহ-ঘোর অন্ধকারে

পূর্ণ। সহসা তাঁহার বোধ হইল যেন, সেই গৃহে সেই অন্ধকারে আর একজন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লণ্ডনে তিনি যেদিন প্রথম রাত্রি যাপন করেন; সেইদিন ঠিক এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন! পূর্ব্বের ন্যায় এই ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার শয্যার চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ করিল, তৎপরে এই মূর্ত্তি শয্যার পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল;—তৎপরে হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। সুরেশ স্পষ্ট বুঝিলেন, এই মূর্ত্তি, যাঁহার মূর্ত্তিই হউক, তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেছেন। কেন তিনি জানেন না—তাঁহার হৃদয়ে বল দেখা দিল; হৃদয়ে আশা পুনরুদ্দীপিত হইল;—তিনি প্রাণে শান্তিলাভ করিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে এই ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল, তিনিও নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

পরদিবস প্রাতে সুরেশ লণ্ডনের রাজপথে মুটেগিরি করিতে প্রস্তুত হইলেন। পেটের জন্য কোন পাপকার্য্য করা অপেক্ষা মুটেগিরি করিয়া খাওয়া ভাল, এই ভাবিয়া তিনি অবাধে বিনা দ্বিধায় লণ্ডনে মুটের কাজ আরম্ভ করিলেন। নাথপুরের সম্ভ্রান্ত বিশ্বাস-বংশের পুত্র সুরেশ বিশ্বাস বিলাতের রাজপথে মুটে ও কুলির কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেন। সুরেশ দেখিলেন, সংবাদপত্র-বিক্রয় অপেক্ষা ইহাতে উপার্জ্জন অনেক বেশী; তিনি যে দিন হইতে এই কার্য্য আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার অনেক কষ্ট ঘুচিল। আহারের কষ্ট একেবারেই রহিল না, বরং তিনি একরূপ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিলেন। এক্ষণে তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন,—কারণ অসুখ-বিসুখ আছে,—সময় সময় কাজকর্ম্ম না জুটিতে পারে;—এরূপ অবস্থায় কিছু অর্থ হাতে থাকা নিতান্তই আবশ্যক। এইজন্য এখন হইতে সুরেশ প্রত্যহ যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা হইতে কিছু কিছু প্রত্যহই সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। মুটের কার্য্যে বেশ দুই পয়সা

রোজগার হইতেছিল সত্য, কিন্তু সুরেশ ইহাতেও বহু দিবস মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কয়েকমাস পরে এ কাজ ছাড়িয়া দিলেন।

---

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

## প্রেম-সঙ্কটে সুরেশ

এই সময়ে সুরেশ বাসা পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি যেরূপ শ্রেণীর লোকের সহিত বাস করিতেছিলেন,—এবার যে বাড়ীতে গেলেন তথায় তদপেক্ষা কথঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোক সকল বাস করিতেন। তবে ইহাঁরা পোষাকপরিচ্ছদে যেরূপ ভদ্র বলিয়া বোধ হইতেন,—প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা সেরূপ ছিলেন না। লণ্ডনের ডিটেক্‌টিভ পুলিস কর্ম্মচারিগণ ইঁহাদের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সহরের কোন স্থানে কোন চুরি জুয়াচুরি হইলে কখনও কখনও এই সকল লোকের মধ্যে কেহ কেহ ধৃত হইতেন।

পূর্ব্বের বাড়ীতে যেরূপ কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, এখানেও কতকগুলি সেইরূপ ছিল। সতীত্ব বলিয়া যে এ সংসারে কিছু পদার্থ আছে, তাহা তাহারা জানিত না, ভাবিতও না। পয়সা ও মদের জন্য তাহারা না পারিত, এরূপ কাজও সংসারে ছিল না। সুরেশ ইহাদের বড়ই প্রিয়পাত্র হইলেন। তাঁহার নিকট ইহারা ভারতবর্ষের গল্প শুনিতে বড়ই ভালবাসিত,—সুরেশও কতক সত্য কতক মিথ্যা ইহাদিগকে নানা গল্প শুনাইতেন।

যাহার শরীরে বল আছে ও হৃদয়ে সাহস আছে, ইংরাজ রমণীগণ

তাহাকে বড় ভালবাসেন। সুরেশের শরীরে অসীম বল ছিল ;—সাহসে সুরেশের সমতুল্য পাওয়া যাইত না। ইংরাজের মধ্যে অল্পলোকই ছিল যে তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিত,—এ কারণেও ঐ সকল ইংরাজ-মহিলা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। সে তাঁহার অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠা এবং বিবাহিতা,—তাহার স্বামী ছুতোরের কাজ করিত। প্রথম হইতেই সে সুরেশকে বড়ই যত্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ;—তাহার হৃদয় যে তাঁহার প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে, সুরেশ ইহা কতক কতক বুঝিতেও পারিয়াছিলেন ;—এক দিন এই রমণী স্পষ্টই নিজ হৃদয়-ভাব সুরেশের নিকট জ্ঞাপন করিল। সুরেশ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে তাঁহার জন্য পাগল ;—কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না! প্রত্যহই তাহার ভালবাসার বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—সে ক্রমে অতি প্রকাশ্যভাবে সুরেশের প্রেম-প্রকাশ করিতে লাগিল ;—এমন কি সুরেশ দেখিলেন যে এই ব্যাপার লইয়া হয়ত বা তাঁহাকে ডাইভোর্স আদালতে যাইতে হয়। রমণী এমনই কাণ্ড করিতে লাগিল যে, এ কথা তাহার স্বামীর কর্ণগোচর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইল! তাহা হইলে যে সুরেশের সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা সুরেশও বেশ বুঝিলেন,—তিনি কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু রমণী তাঁহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না। সুরেশ অতি কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন ;—বিশেষতঃ তাঁহার এ সময়ে কোন কাজ না থাকায়, দুইপ্রহরে যখন সকলে কাজে যাইত, তখন তাঁহাকে গৃহে থাকিতে হইত। এ সময়ে তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া রমণী তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিত,—অনেক সাধ্যসাধনা করিত,—কখন কখন উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিত,—সুরেশ এ মহা-সঙ্কটে পড়িয়া কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

একদিন রাত্রে সুরেশ তাঁহার নিজ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া একমনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন,—এরূপ সময়ে একটি অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী রমণী নিঃশব্দে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল, নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে আসিয়া সহসা ফুঁ দিয়া আলো নিবাইয়া দিল। সুরেশ চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিলেন, কিন্তু কে তাঁহাকে এই সময়ে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিল,—তাঁহার ওষ্ঠ পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল;—সুরেশ কথা কহিতে গেলে হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। সুরেশ অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" রমণী উত্তর করিল, "নিষ্ঠুর, যাহাকে তুমি পাগল করেছ!"

সুরেশের বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি এ রমণীকে জ্ঞাতসারে এরূপ অভিসারে আসিতে কখনও উৎসাহিত করেন নাই। ইহাতে তাঁহার সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে! তিনি ভীত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি করিয়াছেন? এত রাত্রে আমার নিকট কেন আসিয়াছেন? আপনার স্বামী জানিতে পারিলে আপনাকে ও আমাকে উভয়কেই বিপদে পড়িতে হইবে।"

রমণী। বিপদ্! বিপদাপদ বুঝি না। তুমি আমাকে পাগল করিয়াছ। আমি মরি, আমাকে রক্ষা কর।

এই বলিয়া রমণী কাঁদিয়া উঠিল; ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেশ মহাবিপদে পড়িলেন,—কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন রমণী বলিল, "আমার স্বামী বাড়ী নাই, রাত্রে আসিবে না। তার জন্য কোন ভাবনা নাই। বল, তুমি আমায় ভালবাস, তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। তোমাকে না পেলে আমি প্রাণ রাখিব না।"

সুরেশ। এ রকম কথা বলিবেন না। এরূপ কথা বলা শোনা দুই-ই পাপ! আমায় ক্ষমা করুন।

রমণী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সহসা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া ফেলিল, তাঁহার বুকের উপর শুইয়া পড়িল। সুরেশ তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কি মহাশয়, এখনও নিদ্রা যান নাই?" সুরেশ বলিলেন, "না—তারই আয়োজন করিতেছি।" পার্শ্বের গৃহে লোক জাগিয়া আছে দেখিয়া, রমণীও সুরেশকে ছাড়িয়া দিল। বলিল, "একটি বিদায়-চুম্বন দাও, আমি চলিয়া যাই।" সুরেশ কি করেন, তিনি রমণীর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অগত্যা সম্মত হইলেন। তখন সেই রমণী নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল!

জীবনে সুরেশ এরূপ বিপদে আর কখন পড়েন নাই। তিনি এই রমণীর হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবেন? প্রথমে তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার বন্ধু সংবাদপত্র-বিক্রেতা বালকের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন, কিন্তু তৎপর-মুহূর্ত্তেই ভাবিলেন, রমণী হৃদয়কে দমন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে, কেহ সে কথা জানে না; তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া সে তাঁহার নিকট হৃদয়ভাব প্রকাশ করিয়াছে, এরূপ স্থলে তাহার কথা পরকে বলা নিতান্তই অন্যায় হইবে। সুরেশ এ কথা নিজের মনে মনেই রাখিলেন, কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না, তবে এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি এ বাড়ীতে আর বাস করিবেন না। তার পর ভাবিলেন, অন্য কোন বাড়ীতে থাকিলেও রমণী তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া ত বাহির করিতে পারে। অবশেষে তিনি ভাবিলেন যে, তিনি অন্ততঃ মাসকয়েকের জন্য লণ্ডনেই থাকিবেন না। সুরেশ যখন যাহা মনে স্থির করিতেন, তাহা সম্পন্ন

করিতে কাল-বিলম্ব করিতেন না। লণ্ডন ত্যাগ করিতে তিনি মনে মনে যেই স্থির করিলেন, অমনি তাহারই আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। তিনচারি দিন যাইতে না যাইতে তিনি লণ্ডন-সহর পরিত্যাগ করিয়া বিলাতের পল্লীগ্রাম-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

---

# ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

## ফিরিওয়ালা স্থরেশ

লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া স্থরেশ কি করিবেন, তাহা মনে মনে পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে যৎসামান্ত অর্থ ছিল তাহা দিয়া কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিলেন। কলিকাতায় যেমন বহুসংখ্যক পুরাতন-দ্রব্য বিক্রয়ের দোকান আছে,—এই সকল দোকানে যেমন নানাপ্রকার দ্রব্য অতি সস্তায় মিলে, লণ্ডনেও এইরূপ দোকান অনেক আছে। ভাঙ্গা-চুরা নানাদেশের নানাপ্রকার দ্রব্য এই সকল দোকানে বিক্রয়ার্থ থাকে। স্থরেশ কয়দিন ধরিয়া এই সকল দোকানে গিয়া ভারতীয় দ্রব্য যাহা কিছু সস্তায় পাইলেন, তাহা ক্রয় করিলেন। তৎপরে সেইগুলি একটা পোঁটলায় বাঁধিয়া পিঠে ফেলিয়া পদব্রজে বাহির হইলেন। লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি রেল বা গাড়ীতে কোথাও গেলেন না। রেলে বা গাড়ীতে যাইবার তাঁহার অর্থ ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। হাঁটিয়া গেলে দেশের যত দেখিতে পাওয়া যায়, গাড়ীতে গেলে তাহা কখনও হয় না। বহুদিন হইতে বিলাতের পল্লীগ্রামগুলি

দেখিবার জন্য সুরেশের বড়ই কৌতূহল ও ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, এবং ছুতার-রমণীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অভিপ্রায়ে, পদব্রজে বিলাতের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার দ্রব্যাদিও বেশ দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। একে তিনি ভারতবাসী বিদেশী,—অনেকে তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্য, তাঁহার নিকট ভারতবর্ষের কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে গৃহে ডাকিয়া লইয়া যাইত! শেষে, তাঁহাকে কেহ ফিরাইতে পারিত না;—কিছু-না-কিছু ক্রয় করিত। একে তিনি ভারতবাসী, তাহাতে দেখিতেছে ভারতীয় দ্রব্য;—তাহার উপর সুরেশের কতক সত্য কতক মিথ্যা এই সকল দ্রব্যের নানা-ইতিহাস বলায় অনেকেই অধিক মূল্য দিয়া তাঁহার দ্রব্য ক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক-দিনের মধ্যে তাঁহার সকল দ্রব্যই বিক্রয় হইয়া গেল। তাঁহার সমস্ত খরচ-খরচা বাদে তাঁহার দুই পয়সা বেশ লাভও হইল। তিনি আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া, নানা-দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় একদিকে বহির্গত হইলেন। এইরূপে ফিরিওয়ালার কাজ ৪।৫ মাস করিবার পর তিনি দেখিলেন যে, সুখে স্বচ্ছন্দে আহারবিহার করিয়াও তাঁহার প্রায় ১০০।১৫০ টাকা জমিয়া গিয়াছে। যদিও এ কার্য্যে ক্লেশ অনেক হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আমোদও অনেক ছিল। ভারতবাসী বলিয়া সর্ব্বত্রই তিনি বিশেষ সমাদর পাইতেন,—কোন গৃহে যাইতেই তাঁহার প্রতিবন্ধক ছিল না, সকলেই তাঁহার আদর-অভ্যর্থনা করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিলাতের সমস্ত গ্রাম দেখা হইত,—সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের সহিত আলাপ হইত। এইরূপে এই সময়ে তাঁহার সহিত অনেক পল্লীগ্রামবাসী সাহেব-মেমের সহিত বন্ধুত্ব হইয়া-ছিল।

এ দেশের পল্লীগ্রামের ন্যায় ঠিক বিলাতের পল্লীগ্রাম নহে। বিলাতে জঙ্গল একেবারেই নাই, সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি কোন হিংস্র-জন্তু বিলাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিতে গেলে বিলাতে সহরের সংখ্যা অধিক, পল্লীগ্রামের সংখ্যা অল্প। অল্প হইলেও ইংলণ্ডময় নানা সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের নিকট বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে প্রায়ই একটি না একটি বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অট্টালিকায় গ্রামের জমিদার বাস করেন। অনেক সময় হয় ত তিনি এখানে থাকেন না, হয় লণ্ডনে, না হয় অন্যত্র বাস করেন; তাঁহার চাকরবাকরেরা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গ্রামের এক প্রান্তে একটি গির্জ্জা আছেই আছে; অনেক গ্রামে গির্জ্জার নিকট বিদ্যালয়-গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসিগণের অধিকাংশই কৃষক, সকলেরই ২।৪টি গাভী ও ঘোড়া আছে। সে দেশে গাভী দুগ্ধের জন্য পালিত হয়; কৃষিকার্য্যের জন্য বলদ নিয়োজিত হয় না। সেখানে ঘোড়াদ্বারা চাষ করান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সব বাড়ীতেই প্রায় দুই দশটা ভেড়া ও শূকর আছে,—এগুলি ভোজনের জন্য। সব বাড়ীর পিছনেই একটি ক্ষুদ্র বাগান আছে, দুই-দশটা ফুলের গাছ নাই, এমন বাড়ী দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিলাতী কৃষকদিগের বাড়ীগুলি দেখিলে ছবি বলিয়া বোধ হয়, বাড়ীর ছেলেপিলেগুলিও যেন প্রস্ফুটিত ফুল, সকলেই স্বাস্থ্যের পূর্ণ-ছবি।

সুরেশ এইরূপ সুন্দর সুন্দর গ্রামের পর গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়াছেন। এই সকল গ্রামের নিকট প্রায় সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হোটেল ও সরাই আছে। গ্রামবাসিগণ সন্ধ্যার পর কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া গেলে সকলে আসিয়া এইখানে সমবেত হয়েন। সকলেই কিছু কিছু সুরাপান করেন ও চুরুট খাইতে খাইতে নানা কথোপকথন করিতে থাকেন। এইরূপে অনেকরাত্রি কাটিয়া যায়, তখন সকলে যে যাহার

গৃহে প্রস্থান করেন। যেখানে যেদিন রাত্রি হইত, স্থরেশ সেদিন সেখানকার হোটেলেই রাত্রি-যাপন করিতেন। সন্ধ্যার পর হোটেলে তাঁহার নানা-লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় হইত, আমোদ-প্রমোদে, কথাবার্ত্তায় সময় কাটিয়া যাইত।

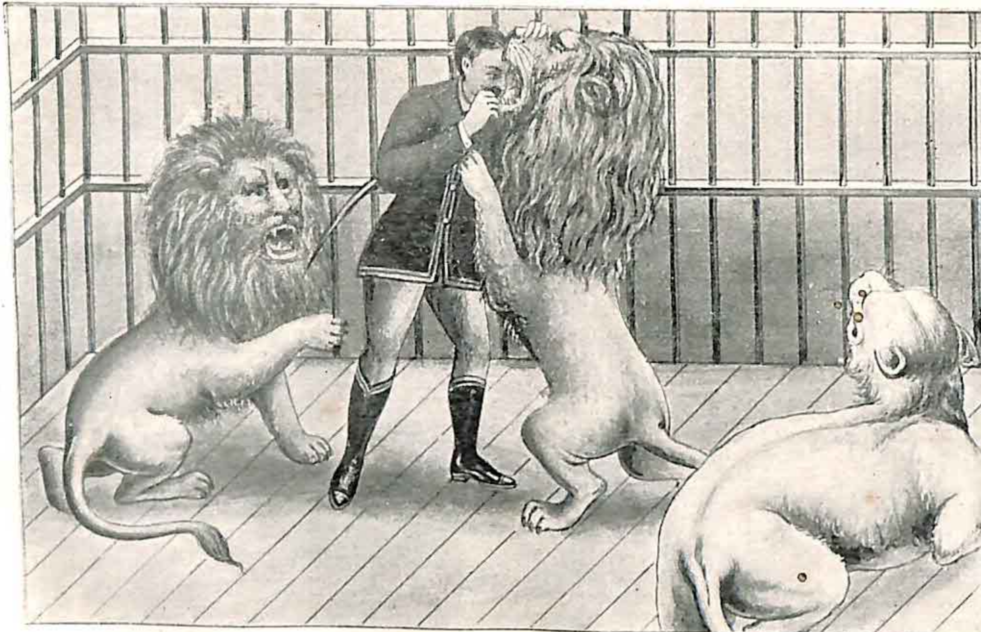
সকাল ব্যতীত অন্ত সময়ে তিনি দ্রব্যাদি বিক্রয়ে বড় স্থবিধা পাইতেন না। অন্যসময়ে সকলেই যে যাহার কাজে চলিয়া যাইত, কাহারও সহিত দেখা হইত না,—কাজেই স্থরেশ সে সময়ে হোটেলে থাকিতেন। কাজেই তাঁহার অনেক সময় কিছুই করিবার থাকিত না। দেখিয়া শুনিয়া স্থরেশ লেখাপড়ার উন্নতি করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে এইরূপ সময় পাওয়ায় ও অর্থের একটু সচ্ছলতা হওয়ায় তিনি পড়া-শোনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল, এবং এই সকল শিক্ষার জন্যই তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইতেন ; ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী প্রভৃতি শিক্ষার জন্য তিনি এই সময়ে ল্যাটিন-গ্রীকেরও আলোচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি যে কয়েক বৎসর ফিরিওয়ালা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিলাতের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছিলেন, সেই কয়েকবৎসরে লেখাপড়ায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেন। এক্ষণে আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা ও শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত ইংরাজগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। বলা বাহুল্য, তিনি এসময়ে পূরা সাহেব হইয়াছিলেন।

---

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

## সার্কাশে সুরেশ

এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে সুরেশ একদিন কেন্ট্ প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র সহরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সেই সহরে একদল সার্কাস-ওয়ালা ক্রীড়া-প্রদর্শন করিতেছিলেন;—এ সার্কাস খুব ভাল বা বড় সার্কাস নহে,—ইঁহারা পল্লীগ্রামে খেলা দেখাইয়া দুই পয়সা রোজগার করিতেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে ইঁহারা এ সহরে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর সার্কাস্-দলের ক্রীড়কগণ সকলেই সুরেশ যে হোটেলে বাস করিতেছিলেন, সেইখানে আমোদ-প্রমোদ ও কথাবার্ত্তা কহিতে আসিলেন। ক্রমে সুরেশের সহিত ইঁহাদের আলাপ-পরিচয় হইল, উভয়পক্ষেই নানা-কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে সুরেশ ভারতবর্ষের অনেক কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন, এবং তাঁহারাও সুরেশের প্রশ্নে সুরেশকে সার্কাসের অনেক কথা কহিলেন। সার্কাসে যে কত আমোদ, কত উৎসাহ, কত প্রশংসা, কত যশঃ, কত খ্যাতি, তাহা মহোৎসাহে তাঁহারা সুরেশকে বলিতে লাগিলেন, শুনিয়া সুরেশের মন তাঁহাদের কথায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। তিনি সে রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; নানা-চিন্তায় হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল, সার্কাসের দলে মিশিতে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি ফিরিওয়ালা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে স্থির-সঙ্কল্প হইলেন, ভাবিলেন, যদি এই সার্কাস-দলে মিশিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে খ্যাতিলাভ ত হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থও



সার্কাসে সুরেশ

উপার্জ্জন হইবে,—আর আমোদ-প্রমোদ ও স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ত কথাই নাই। এইরূপ নানাচিন্তায় তাঁহার নিদ্রা হইল না, ভোর হইতে না হইতে তিনি সেই সার্কাস্-দলের ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন! সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "যদি, আপনি আমাকে সার্কাস্-দলে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কুস্তি, জিম্-নাষ্টিক প্রভৃতির খেলা দেখাইতে পারি।" স্থরেশকে দেখিলে বলবান্ বলিয়া বোধ হইত না; তিনি আকারে খর্ব্বাকৃতি, দেহও সেরূপ বলিষ্ঠ ছিল না, তবে তাঁহার মাংসপেশীসকল বোধ হয় লৌহ অপেক্ষাও কঠিন ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি ব্যায়ামপটু, কলিকাতায় অনেক জিম্‌নাষ্টিক ও কুস্তি করিয়াছেন,—বিলাতে আসিয়াও তিনি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। সময় ও স্থবিধা পাইলেই ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার শরীরে এইরূপে অসীম বল হইয়াছিল, কিন্তু ম্যানেজার সাহেব তাঁহার আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে বলবান্ বলিয়া ভাবিলেন না। তিনি যুবক স্থরেশের কথায় মৃদুহাস্য করিলেন। স্থরেশ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আমাকে পরীক্ষা করুন।" বোধ হয়, একটু মজা করিবার জন্যই ম্যানেজার সাহেব তাঁহার দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান্ ক্রীড়ককে আহ্বান করিলেন। আকৃতিতে সে দীর্ঘকায় ও বলে অস্থর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে উপস্থিত হইলে ম্যানেজার সাহেব স্থরেশকে বলিলেন, "তুমি ইহার সহিত লড়িতে পার?" স্থরেশ বিনা দ্বিধায় বলিলেন, "কুস্তি হয় ত পারি।"

তখন উভয়ে কুস্তির আয়োজন হইল, তৎপরে উভয়ে কুস্তি আরম্ভ হইল। অচিরে দর্শকমাত্রেই বুঝিল যে, সাহেবক্রীড়কের শরীরে কিছু বল অধিক থাকিলেও দক্ষতায় তিনি কোন অংশেই এই অসিতবর্ণ ভারতবাসীর সমকক্ষ নহেন; ১০ মিনিট যাইতে না যাইতে তিনি পরাজিত হইলেন! স্থরেশ তখন হোরাইজাণ্টাল্ ও প্যারেলাল বারেও

ক্রীড়া দেখাইতে চাহিলেন, কিন্তু ম্যানেজার সাহেব তাঁহার ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "না; আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আমাদের দলে যোগ দিতে পার।"

সেই দিন হইতে সুরেশ সেই সার্কাস্‌দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। মাহিয়ানারও একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল। সার্কাস্‌দল হইতে তিনি সমস্ত আহারাদির ব্যয় পাইবেন, অধিকন্তু সপ্তাহে ১৫ শিলিং করিয়া পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। যদিও সার্কাস্-ক্রীড়কদিগের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী মাহিয়ানা ছিল, তবুও সুরেশ এই মাহিয়ানাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনি নূতন, ক্রমে কাজ শিখিলে অবশ্যই তাঁহার বেতনের হার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে। এ দলে না হয়, অন্য দলে মিলিবে। এক দিকে সপ্তাহে ১৫ শিলিং পাইয়া সুরেশ যেরূপ উৎফুল্ল হইলেন, অন্যদিকে ম্যানেজার সাহেবও একজন প্রকৃত কৃষ্ণকায় ভারতবাসী এত সস্তায় পাইয়া মনে মনে বিশেষ প্রীত হইলেন। এখন বিজ্ঞাপন দিবার খুব সুবিধা হইবে,—প্রকৃত ভারতবাসীর খেলা জানিলে সার্কাস্ দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক আসিয়া পড়িবে!

তাহাই হইল। সাসেক্স্ প্রদেশের ক্ষুদ্র একটি সহরে আসিয়া ম্যানেজার বিজ্ঞাপন দিলেন, "অদ্য রাত্রে এক ভারতবর্ষীয় যুবক অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইবেন।" সহরে যত লোক ছিল, সে রাত্রে সকলে আসিয়া সার্কাসের তাম্বু পূর্ণ করিল, সুরেশ সার্কাস্‌ওয়ালা হইয়া, সার্কাসের রং-বেরঙের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, দর্শকদিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মনের যে কিরূপ অবস্থা হয়, এ অবস্থায় না পড়িলে তাহা উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারা যায় না। মুহূর্ত্তের জন্য সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণ হৃদয়ে যেন বসিয়া গেল, তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দর্শকদিগের ঘোর করতালিতে

তাঁহার সংজ্ঞা হইল, এবং আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া খেলা আরম্ভ
করিলেন।

প্রতি-পদেই করতালি; প্রতি-পদেই প্রশংসা। সুরেশ সেদিন
যেরূপ অদ্ভুত-কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন,
তাহাতে তিনি নিজেই বিমোহিত হইয়াছিলেন। প্রশংসার উপর
প্রশংসার সহিত খেলা শেষ করিয়া সুরেশ দর্শকদিগের নিকট হইতে
বিদায় লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পরও
করতালিধ্বনিতে রঙ্গস্থল কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত মাতিয়া ছিল। আহ্লাদে
উৎফুল্ল হইয়া ম্যানেজার সাহেব তাঁহার পাণিপীড়ন করিলেন। অন্যান্য
অভিনেতা অভিনেত্রীগণও তাঁহার গৌরবে ও প্রশংসায় বিশেষ আনন্দ
প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

প্রথম রাত্রির পর সুরেশ ইংলণ্ডের নানাসহরে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে
উপস্থিত হইয়া নানা ক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। সার্কাস্‌ক্রীড়ক
বলিয়া খ্যাতি-লাভ তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনা; সার্কাস্‌ক্রীড়ক
বলিয়া যাহাতে তিনি জগতে অদ্বিতীয় হইতে পারেন, তাহাই তাঁহার
জীবনের ব্রত হইল। যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, প্রাণপণে চেষ্টা
পাইলে সিদ্ধ-মনোরথ হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ সুরেশ চির-
কালই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন,—যখন যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন,
যতক্ষণ না তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতেন, ততক্ষণ তাহা ছাড়িতেন
না। এক্ষণে সার্কাসে প্রবিষ্ট হইয়া যাহাতে প্রতিপত্তি-লাভ করিতে
পারেন, তাহার যত্ন বা পরিশ্রমের ত্রুটি করিলেন না। দিবসের
অধিকাংশ সময়ই আপন ব্যবসায়ে দক্ষতা-লাভ করিবার জন্য তাহার
অনুশীলন করিতেন,—কাজেই দেখিতে দেখিতে তিনি একজন অতি
সুদক্ষ ক্রীড়ক হইয়া উঠিলেন। দেশ-দেশান্তরে যেখানে তাঁহাদের
ক্রীড়া হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই তাঁহার খ্যাতিও বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল,—ক্রমে ভারতবাসী সার্কাস্‌ওয়ালার নাম চারিদিকেই ব্যাপ্ত হইল।

সার্কাসে প্রবেশ করিয়া সময় পাইলেই তিনি ক্রীড়া-অনুশীলন এবং সুযোগমত নানা পুস্তকাদি পাঠ করিতেন;—কিন্তু অনেক সময় তাঁহার সহ-সার্কাস্‌ক্রীড়কগণ তাঁহার পড়া-শুনার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইত। বিশেষতঃ তাঁহাদের দলে যে কয়েকটি বালিকা ছিল, তাহারা তাঁহাকে বড়ই জ্বালাতন করিত;—তাঁহার হাতে বই দেখিলেই কাড়িয়া লইত,—তাঁহাকে পড়িতে দেখিলে তাঁহার নিকটে আসিয়া হাসিত, তাঁহাকে হাসাইত, কিছুতেই পড়িতে দিত না। দলের অধিকাংশ যুবক-যুবতীই সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে থাকিতে ভালবাসিত,—তাহাদের নিকট আমোদ-প্রমোদই জীবনের সারব্রত ছিল; সময় ও সুবিধা পাইলেই হাসি তামাসা খেলা-ধূলায় সময় কাটাইত,—ইহারা সুরেশকেও দলে লইবার জন্য ব্যগ্র হইত, তাঁহাকে পড়া শুনা করিতে দেখিলে নিকটে আসিয়া ব্যাঘাত ঘটাইত।

এইরূপ সার্কাস্-দলে সুরেশের দিন কাটিতে লাগিল। এ দলের সহিত তিনি ইংলণ্ডের নানা সহরে ভ্রমণ করিলেন;—কিন্তু তিনি স্বদেশকে একেবারে ভুলেন নাই, আত্মীয়-স্বজনের নাম তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সাহেবদলে মিশিয়া, পূরা সাহেব হইয়া, তিনি তাঁহার স্বজাতিকে ভুলেন নাই। তিনি বরাবরই নিয়মিতরূপে তাঁহার খুল্লতাত কৈলাসবাবুকে পত্র লিখিতেন। যখন যেখানে যাইতেন, যাহা করিতেন, যে ভাবে থাকিতেন, সকলই তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইতেন। স্নেহময়ী জননীর জন্য তিনি সর্ব্বদাই হৃদয়ে ব্যথা পাইতেন;—প্রত্যেক পত্রেই মাকে প্রণাম জানাইতেন,—পত্রের অধিকাংশই মায়ের কথায় পূর্ণ থাকিত। কখন কখন যে দেশে ফিরিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইত,—আত্মীয়-স্বজনকে

দেখিবার জন্য উৎসুক হইত, কখন কখন তাঁহার হৃদয় মায়ের জন্য কাঁদিয়া উঠিত, তাহা তাঁহার এই সময়ের পত্র পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার কয়েকখানা পত্র পরিশিষ্টরূপে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল।

# অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

## জার্ম্মান্‌বালিকা ও সুরেশ

সুরেশ পূর্ব্বে বিদেশে যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার আহারবিহারের কোন কষ্ট নাই;—সপ্তাহে সপ্তাহে ১৫।২০ শিলিং উপরন্তু পাইতেছেন; তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ভাল হইয়াছে, তিনি এক্ষণে ভদ্রসমাজে ভদ্রভাবে মিশিতে পারিয়াছেন, এইরূপে তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে মান-সম্ভ্রমে থাকিয়া ক্রমাগত খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন।

এক্ষণে তিনি আর বালক নহেন—যৌবনে উপনীত হইয়াছেন। যৌবন-সুলভ ভাবাবেশে তাঁহার দেহ-মন সমস্তই উৎফুল্ল হইয়াছে,—তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই প্রেম দেখা দিয়াছে। সার্কাস্‌দলে কয়েকটি বালিকা ছিল, ইহার মধ্যে একটি জার্ম্মান্‌,—জার্ম্মানি দেশে জন্ম।—তবে এই বালিকা বা যুবতী জার্ম্মান্‌ হইলেও ঠিক ইংরাজের ন্যায় ইংরাজী বলিতে পারিতেন। ইনি ইঁহার গতজীবনের বিষয় কাহাকেও কিছু বলিতেন না,—ইঁহার পিতা-মাতা বা গৃহের কথা কেহ জানিত না, কেহ এ সম্বন্ধে কথা তুলিলে ইনি বিলক্ষণ বিরক্ত হইতেন, ভ্রূকুটি করিতেন। ইঁহার প্রকৃতি বড় গম্ভীর ছিল,—ইঁহার সেই গাম্ভীর্য্যে

দলের সকলে ইঁহাকে ভয় করিত,—মান্য করিত। দলের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ঘটিলে ইনি উপস্থিত হইয়া নিরস্ত হইতে আজ্ঞা করিলে তখনই সকল মিটিয়া যাইত,—ইঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না।

অন্যান্য বালিকাগণ অপেক্ষা শিক্ষায় ও বংশমর্য্যাদায় যে ইনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত;—দেখিতে তাহাদের অপেক্ষা বিলক্ষণ সুন্দরীও ছিলেন। বিশেষতঃ ইঁহার চুল ঘন-কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় সুরেশ ইঁহাকে বড়ই সুন্দরী দেখিতেন। ইঁহার ভালবাসা পাইবার জন্য দলের অনেকেই লালায়িত হইয়াছিল। বাহিরের দর্শকগণের মধ্যেও অনেকে ইঁহার জন্য পাগল হইয়াছিল;—কিন্তু ইনি কাহাকেও কোনরূপে উৎসাহিত করিতেন না। সকলেই ইঁহার গম্ভীর ভাবে ভীত হইতেন; ইঁহার সহিত কোনরূপ প্রেমালাপ করিতে কেহ কখন সাহস পাইত না; কিন্তু ইঁহার প্রাণ যে সুরেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে অনেক সময় ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইত। ইনি প্রকাশ্যভাবে, সকলের সম্মুখে, অন্যান্যের ন্যায় সুরেশের সহিত বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন; অন্যান্যকে যেরূপ দেখিতেন, সুরেশকেও তেমনই দেখিতেন;—সুরেশের প্রতি বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেন না। তবে ঘটনাক্রমে যখন ইনি সুরেশের সহিত একাকিনী একত্র হইয়া পড়িতেন, তখন ইঁহার গাম্ভীর্য্যভাব লোপ পাইত। সুরেশের প্রতি তখন প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। অনেক সময় অতর্কিত অবস্থায় তাঁহার হৃদয়ভাব প্রকাশপ্রায় হইত, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সতর্ক হইতেন। ফলে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বিশেষ আমোদ পাইতেন; পড়া-শুনায় তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন, তাঁহার গত জীবনের সমস্ত কথা শুনিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিতেন। তিনি মনোভাব গোপন করিবার

চেষ্টা করিলেও সময় সময় পারিতেন না। তাঁহার বদনে, তাঁহার চক্ষে, তাঁহার মনের ভাব প্রতিফলিত হইত। সুরেশ যে ইহা একেবারে বুঝিতেন না তাহা নহে,—তবে তিনি তাঁহার মনকে একথা বিশ্বাস করিতে দিতেন না! তিনি স্বতঃই মন হইতে সর্ব্বদাই রমণী-মূর্ত্তি অন্তর্হিত করিবার প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি যতই চেষ্টা করেন, যতই হৃদয়কে দমন করিতে চাহেন, ততই হৃদয়ের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তাঁহার বিবাহের অবস্থা নহে, তিনি এক্ষণে যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে মেম-বিবাহ করা চলে না। বিবাহ করিয়া তাহাকে লইয়া কোথায় যাইবেন? ইংরাজী হিসাবে এক্ষণে তাঁহার বয়সও হয় নাই,—এখন বিবাহের ইচ্ছাকে তাঁহার হৃদয়ে কোন মতেই স্থান দেওয়া উচিত নহে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি হৃদয় হইতে রমণী-প্রীতি দূর করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে লুকায়িত করিবার জন্ম সর্ব্বদা চেষ্টিত রহিলেন, তথাচ সময় সময় যখন তিনি এই জার্ম্মান্ রমণীর সহিত একত্র একাকী থাকিতেন, তখন ভাবভঙ্গীতে এই রমণীর প্রতি তাঁহার অন্তর্নিহিত-প্রেমাভাস প্রকাশ হইয়া পড়িত! ফলে অন্য কেহ তাঁহাদের মনোভাব জানিতে না পারিলেও তাঁহাদের দুই জনে দুই জনের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন।

একদিন সুরেশ বাজার হইতে নিজ প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলেন। এইরূপ দ্রব্যাদি আনিলে উক্ত জার্ম্মান্ বালিকাই প্রায় সেগুলি লইয়া সরাসর গুছাইয়া রাখিতেন। অদ্যও ইনি সুরেশের ক্রীত দ্রব্যাদি এক এক করিয়া কাগজের মোড়ক হইতে খুলিয়া তাঁহার বাক্সে গুছাইতেছিলেন। একটি দ্রব্য একখানি

পুরাতন জার্ম্মান্ সংবাদপত্রে জড়িত ছিল। নিজদেশের সংবাদ-পত্র বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, বালিকার দৃষ্টি সেই কাগজের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি কাগজখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার নয়নপথে একটি বিজ্ঞাপন পড়িল। বিজ্ঞাপনটিতে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ,জননী স্বীয় নিরুদ্দিষ্ট কন্যাকে সত্বর তাঁহার সহিত মৃত্যুকালে একবার দেখা করিবার জন্য কাতর-ভাবে অনুনয় করিতেছেন। বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া বালিকার দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিত-ধারে নয়নাম্বু বহিল। সুরেশ অন্যদিকে চাহিয়া-ছিলেন, সহসা ফিরিয়া বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত ও ব্যথিত হইলেন, তিনি সাদরে বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে সপ্রেমে তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রশ্নে বালিকা শোকে আরও অভিভূতা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হস্তে কাগজ-খানি দিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুরেশ বালিকার নিকটই কিছু কিছু জার্ম্মান্ ও ফ্রেঞ্চ শিক্ষা করিয়াছিলেন,—সুতরাং তিনি পাঠ করিয়া বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম একরূপ জ্ঞাত হইতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, বালিকার সদ্বংশে জন্ম, বাল্যকালে কেবলমাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে সার্কাস্ শিক্ষা করিবার জন্য ইনি গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার পলায়নের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এখন তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা! মৃত্যুশয্যায় একবার কন্যাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। নিরুদ্দিষ্ট কন্যা কোথায় তিনি তাহা জানেন না, তাই কাতরভাবে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। কন্যাও এ সময়ে মাতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইলেন।

পরদিবস তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন। সুরেশ তাঁহাকে লণ্ডন পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে

চলিলেন। লণ্ডন বন্দরে বালিকা একখানি ভাল জাহাজে উঠিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাহাজে সুরেশকে বিদায় দিবার সময় তিনি তাঁহার হৃদয়ভাব আর লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি যে সুরেশের নিকট তাঁহার হৃদয় প্রাণ সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিলেন। শুনিয়া সুরেশের প্রাণ হর্ষ-বিষাদে পূর্ণ হইল, তিনি সজল-নয়নে সাদরে বালিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন;—বলিলেন, "তোমায় আমায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আমাদের বিবাহের সম্ভাবনা নাই। আমাকে ভুলিয়া যাও, যদি পারি, আমিও ভুলিবার চেষ্টা করিব।"



## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### শুভাদৃষ্টের পথে সুরেশ

সার্কাসে সুরেশের খ্যাতি ভাল কুস্তিবাজ বা জিম্‌নাষ্টিক্‌কারী বলিয়া নহে;—দুর্দ্দমনীয় হিংস্র বন্যপশু বশীভূত করিবার ক্ষমতার জন্যই তিনি বিখ্যাত। মহাদুর্দ্দান্ত ভয়ানক ভয়ানক আফ্রিকাদেশীয় সিংহ-সিংহীকে তিনি কুকুরের ন্যায় বশ করিতেন,—অবলীলাক্রমে তাহাদের পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত সাহসে দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া থাকিতেন; রুদ্ধশ্বাসে তাঁহার কাণ্ড—অসমসাহসিক কীর্ত্তি দর্শন করিতেন। আমেরিকা-দেশীয় অসভ্যজাতির সহিত তিনি যে পরে বিপুল সাহসে ঘোর-যুদ্ধ করিয়াছিলেন,—তাহা অপেক্ষা এই সকল হিংস্র পশুর সহিত ক্রীড়া কম সাহসের কার্য্য নহে।

যখন তিনি সার্কাস্‌দলের সহিত বিলাতের নানা সহরে ঘুরিতেছিলেন, সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে একদিন সুবিখ্যাত হিংস্রপশু-বশকারী প্রফেসার জাম্‌বাক্‌ সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হিংস্রপশু বশ করিতে ইহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না,—হিংস্রপশুদিগের স্বভাব দেখিবার জন্য ইনি নানা দেশের নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছেন,—ভারতবর্ষে আসিয়াও ভারতের নিবিড় অরণ্যমধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তীর সহিত বাস করিয়াছেন,—ইয়োরোপে সে সময়ে ইঁহার তুল্য পশুবশকারী আর কেহ ছিলেন না। সুরেশকে দেখিয়া সুরেশের সাহসে, সুরেশের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে, সুরেশের মানসিক বলে, তিনি সুরেশের প্রতি প্রীত হইলেন এবং নিজ সহকারিরূপে তাঁহাকে পশুবশ-কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুরেশ তাহাই চাহেন,—এত দিনে অদৃষ্টদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন,—তিনি ধন-মান-যশের পথে অগ্রসর হইলেন। জাম্‌বাক্‌ সাহেব প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি সাগ্রহে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সার্কাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত তিনি তাঁহার পশুশালায় গমন করিলেন।

এখানে জাম্‌বাক্‌ সাহেবের অধীনে তিনি নানা-হিংস্রজন্তু বশ করিয়া তাহাদের সহিত নানা-ক্রীড়া-কৌতুক করিতে লাগিলেন। সিংহ ও ব্যাঘ্র বশ করা ও তাহাদের সহিত ক্রীড়া করাই তাঁহার একান্ত প্রিয় কার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে এত সুদক্ষ হইলেন যে, জামবাক্‌ সাহেব দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন,—প্রকৃতই তাঁহার সহকারীদিগের মধ্যে সুরেশের সমকক্ষ—তাঁহার ন্যায় কার্য্যদক্ষ আর কেহই ছিল না।

এইরূপে দুই বৎসরকাল জাম্‌বাক্‌ সাহেবের নিকট থাকিয়া তিনি পুনরায় সার্কাস্‌দলে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে সার্কাসে তিনি ব্যাঘ্র, সিংহের সহিত খেলা দেখাইয়া দর্শকদিগকে মোহিত ও স্তম্ভিত করিতে

লাগিলেন। যখন যেখানে তাঁহার খেলা হইয়াছিল, সেই স্থলে সকলেই তখন তাঁহার অমানুষিক সাহসে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক আভিজাত্য সম্প্রদায়ের ও রাজন্যবর্গের সম্মুখে ক্রীড়া দেখাইয়া তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত ইয়োরোপে তাঁহার নাম প্রচার হইতে লাগিল! সকলেই তাঁহাকে চিনিল;—অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে মহা-প্রদর্শনী হয়, সুরেশ সেই প্রদর্শনীতে সিংহ ও ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া করিয়া জগদ্ব্যাপী খ্যাতি লাভ করিলেন। এই সময়ে তিনি বহুসংখ্যক মেডেল ও সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন, এখানে সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সার্কাস্‌দলের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি এক সময়ে হাম্‌বার্গ নগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে গাজেন্‌বাক্ নামক এক সাহেবের এক বৃহৎ পশুশালা ছিল। ইনি দেশ বিদেশ হইতে নানা-পশু আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে নানা-রূপে শিক্ষা দিয়া তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পশুশালায় বা ভিন্ন ভিন্ন সার্কাস্‌দলে এই সকল পশু বিক্রয় করিতেন। ইহাই ইঁহার ব্যবসা ছিল এবং এই ব্যবসায়ে ইনি বিলক্ষণ অর্থও উপার্জ্জন করিতেন। হিংস্র-পশুর সহিত সুরেশের ক্রীড়া দেখিয়া, ইনি সুরেশকে নিজ পশুশালায় নিযুক্ত করিতে ব্যগ্র হইলেন, এবং সার্কাসে যে বেতন পাইতেন, তাহা অপেক্ষা অধিক বেতন দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুরেশও সার্কাস পরিত্যাগ করিয়া, গাজেন্‌বাক্ সাহেবের পশুশালায় কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

এখানে সুরেশ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি বন্য পশুদিগকে নানা ক্রীড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন; এবং নিজে অন্য পশুর কথা দূরে থাকুক, দুর্দ্দান্ত সিংহ-ব্যাঘ্রকে কুকুর-বিড়ালের ন্যায় বশীভূত করিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতেন,—তাহারা তাঁহার হাত চাটিত, গা চাটিত,—তিনি তাহাদের ভয়াবহ মুখের ভিতর তাঁহার

মস্তক প্রবেশ করিয়া দিতেন,—এই সকল ভয়ানক পশু যে তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহা তিনি ভাবিতেন না। ভয় বলিয়া যে একটা ভাব আছে, তাহা তাঁহার হৃদয়ে কদাপি স্থান পাইত না। একটি ব্যাঘ্রকে তিনি শৈশব হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন,—ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'ফ্যানি'।—এটি ইঁহার এত অনুগত হইয়াছিল যে, কুকুরও বোধ হয় তত হয় না।—স্থরেশকে ইহার সহিত খেলা করিতে দেখিলে লোকে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। একটি হস্তীকে তিনি এমন শিক্ষিত করিয়াছিলেন যে, তিনি না খাওয়াইলে সে খাইত না। জোগ কার্ল নামক জনৈক পশুব্যবসায়ী বহুমূল্যে এটি ক্রয় করেন, কিন্তু তিনি এটিকে লইয়া গিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। স্থরেশের অভাবে সে আহার পরিত্যাগ করিল,—কিছুতেই আহার করিল না। কার্ল সাহেব এমন স্থশিক্ষিত হস্তীর লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অগত্যা তিনি অধিক বেতনে স্থরেশকে আপনার পশুশালায় নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

জাম্‌বাক্ সাহেবের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্থরেশ বহুদিবস কার্ল সাহেবের নিকট কাজ করিতে লাগিলেন। এখানেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। হিংস্র-পশুগণ যেন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব,—তিনি সর্ব্বদা ইহাদের সহিত বাস করিতেন,—ইহাদের সহিত, ইহাদের নিকট, আহার-বিহার করিতেন,—স্বহস্তে ইহাদিগকে আহার দিতেন,—ইনিও তাহাদিগকে ভালবাসিতেন, তাহারাও তাঁহাকে ভালবাসিত। তাঁহার শিক্ষিত পশুসকল বহুমূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে স্থরেশেরও বহু অর্থাগম হইতে লাগিল। ধনে মানে এক্ষণে তিনি একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত-লোক। এক্ষণে তিনি আর সে স্থরেশ নাই।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## প্রেম-পীড়নে সুরেশ

এমন মানুষ নাই, যাঁহার হৃদয়ে কখন না কখন নারী-প্রেম দেখা দিয়াছে। বোধ হয়, কেবল হিন্দু-যোগিগণই নিজ নিজ সাধনার বলে হৃদয় হইতে দুর্দ্দমনীয় কামিনীকাঞ্চনানুরাগ উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাঁরাই কেবল যোগ-সাধনার বলে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযমন একরূপ অসম্ভব,—এমন মানুষ নাই, যিনি জীবনের কোন না কোন সময়ে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য-পিপাসায় পীড়িত হইয়া কামিনীর কমনীয় রূপে আকৃষ্ট না হইয়াছেন ও প্রেমের তরঙ্গে পতিত হইয়া আত্মহারা না হইয়াছেন।

সুরেশও প্রেমের হাত এড়াইতে পারিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সার্কাসের জার্ম্মান্ বালিকার প্রতি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তিনি জানিতেন যে, জার্ম্মান্ বালিকাকে লাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, এই জন্য তিনি তাঁহার হৃদয়কে দমন করিতে-ছিলেন, বালিকাকে ভুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিলেন। বালিকা সার্কাস্ পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পত্রাদি লিখিতেন। বালিকার বিরহে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই হৃদয়-বেদনার মধ্যেও মনে একটু সান্ত্বনা পাইলেন। ভাবিলেন, বালিকার নিকট হইতে দূরে থাকিলে, বালিকাকে না দেখিলে, তিনি তাহাকে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত করিতে পারিবেন; এই উদ্দেশে—বালিকার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার

জন্ম—তিনি তাহার পত্রের উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। কিন্তু হায়! এত করিয়াও তিনি সেই সুন্দর মুখখানি ভুলিতে পারিলেন না! অহোরাত্রি সেই সুন্দর মুখখানি তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল! বালিকার সহিত আর কখনও দেখা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ না হইলে তিনি চাই কি তাহাকে ভুলিলেও ভুলিতে পারিতেন; কিন্তু "মানুষের আর্জ্জি, দেবতার মর্জ্জি" বা "মানুষে গড়ে, দেবতায় ভাঙ্গে"; তিনি মনে মনে যাহা স্থির করিলেন, ঘটনাচক্রে তাহা উল্টাইয়া গেল।

সুরেশ সার্কাস্-দলের সহিত ইয়োরোপের নানা সহরে ফিরিতে-ছিলেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি জার্ম্মান্-দেশীয় একটি নগরে উপস্থিত হইলেন। সহসা একটা দোকানে তিনি সেই জার্ম্মান্ বালিকাকে দেখিলেন। তিনি এক্ষণে আর বালিকা নাই, পূর্ণ-যৌবনে প্রস্ফুটিতা; সুরেশ এখন আর সেই পূর্ব্বের শ্মশ্রুহীন সুরেশ নাই, তিনিও যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। বহুকাল উভয়ে উভয়কে দেখে নাই, উভয়ের আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু উভয়ে কেহও কাহাকে বিস্মৃত হন নাই। যখন উভয়ে সম্মুখীন হইলেন, তখন উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। যদিও বহুদিন উভয়ের সাক্ষাৎকার নাই, তবুও এইরূপ সহসা উভয়ের দর্শনে উভয়েই বুঝিলেন যে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভুলিতে পারেন নাই। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরে উভয়ে উভয়ের হস্ত-ধারণ করিয়া সেই দোকান হইতে বহির্গত হইলেন। নিকটস্থ উদ্যানে নির্জ্জন বৃক্ষনিম্নস্থ বেঞ্চে বসিয়া উভয়ে কত কথা কহিলেন;—কত দিনের কত কথা, সে কথার শেষ নাই, বিরাম নাই। প্রেমিক-যুগলের প্রেম-কথোপকথন দীর্ঘ-বিরহের পর মিলনকালে যে কত মধুর, কত কোমল, তাহা প্রেমিক ভিন্ন অপরে কি বুঝিবেন!

সেদিনের জন্য উভয়ে উভয়কে প্রেমালিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলেন; কিন্তু সেই সাক্ষাৎ শেষ-সাক্ষাৎকার নহে;—সেই দিন হইতে প্রায়ই প্রত্যহ উভয়ে গোপনে ও নির্জ্জনে সাক্ষাৎকার করিতে লাগিলেন। যুবতী ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা, পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তিনিই এক্ষণে বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী;—সুতরাং তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য দেশের মান্যগণ্য অনেকে ব্যগ্র। এরূপ স্থলে যুবতীর আত্মীয়-স্বজনগণ যে অজ্ঞাত-কুলশীল এক অপরিচিত অসিতকায় ভারতবাসীর সহিত, সামান্য পশু-শিক্ষকের সহিত তাঁহার বিবাহে সম্মত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যাহাতে যুবতী যুবকের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে না পারেন, তাঁহারা প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রাবৃট্-কালের স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রেমের স্রোত প্রবল-তরঙ্গময়ী, কে সেই বেগের প্রতিবন্ধক হইতে পারে? যুবতীর আত্মীয়-স্বজন যতই প্রতিবন্ধকাচরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রেমস্রোতও ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে কোন উপায়ে হউক, তিনি প্রত্যহ গোপনে সুরেশের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রেমে উন্মত্ত, হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড সমস্তই ভুলিলেন; এরূপ ব্যাপারে যাহা হয়,—তাহাই ঘটিল'—যুবতী কলঙ্কের ডালি মাথায় করিলেন।

এ কথা বহুকাল গোপন রহিল না। ক্রমে যুবতীর আত্মীয়স্বজন সকলেই যুবতীর কলঙ্কের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহারা ক্রোধান্ধ হইয়া সুরেশের প্রাণ-সংহার করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অতঃপর সুরেশের জার্ম্মানিতে থাকা দায় হইল, তিনি প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মানি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। জার্ম্মানি পরিত্যাগ করিয়াও তিনি নির্ভয় বা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যুবতীর আত্মীয়গণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন, নগরে নগরে

তাঁহার অনুসন্ধানে লোক লাগাইলেন। অগত্যা সুরেশ বাধ্য হইয়া ইয়োরোপ পরিত্যাগ করিলেন; আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সুদূর আমেরিকায় প্রস্থান করিলেন। বহুদিবস হইতে তাঁহার আমেরিকা দেখিবার সাধ ছিল, এক্ষণে এক বৃহৎ সার্কাস্-দলে নিয়োজিত হওয়ায় তাঁহার সেই বহুদিনের পোষিত ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুবিধা হইল। তিনি সেই দলের সহিত মার্কিণ-দেশে যাত্রা করিলেন।"

---

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## ব্রেজিলে সুরেশ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েল্ সাহেবের সুবিখ্যাত হিংস্র পশুপ্রদর্শনী-দলে সুরেশ কার্য্য-গ্রহণ করিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি ঐ দলের সহিত আমেরিকায় গমন করিয়া নানা স্থানে নানা ক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে ক্রীড়া প্রদর্শিত হইল, সর্ব্বত্রই সুরেশ বিশেষ প্রশংসা-লাভ করিলেন।

ইয়োরোপ ও ইংলণ্ড হইতে এক্ষণে মার্কিণ-দেশ অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। শোভা-সমৃদ্ধির তুলনায় মার্কিণের নিউইয়র্ক্ নগর এক্ষণে লণ্ডনের নিম্নেই পরিগণিত; এরূপ সহর জগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;—সভ্যতার বলে, জ্ঞানে, বিদ্যায় নিউইয়র্কবাসীদিগের সমকক্ষ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সুবিখ্যাত নিউইয়র্ক নগরেও সুরেশ ব্যাঘ্র-সিংহের সহিত অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা হইতে

লাগিল, বড় বড় সংবাদ-পত্রে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল, নিউইয়র্কের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে কেবল তাঁহার কথার আন্দোলন হইতে লাগিল।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ হইতে তিনি সার্কাস্ দলের সহিত প্রথমে মেক্সিকো, পরে দক্ষিণ-আমেরিকার বিস্তৃত সাম্রাজ্য ব্রেজিলে উপনীত হইলেন। তাহার পুর্ব্বে আর কখন কোন বাঙ্গালী এই দূরদেশে গমন করেন নাই। ব্রেজিল-সাম্রাজ্য প্রায় ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ, দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত মধ্যপ্রদেশ এই সাম্রাজ্যভুক্ত। এক্ষণে প্রথমে স্পেন্ ও পর্টুগালবাসিগণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন! তাঁহারা এই দেশের আদিম-নিবাসী স্ত্রীদিগের সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হওয়ায় এক বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়, এই জাতি ক্রিয়োগ্ নামে খ্যাত। এক্ষণে ব্রেজিলের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ব্যতীত পর্টুগিজ প্রভৃতি শ্বেতজাতির সহিত কাফ্রিস্ত্রীলোকদিগের পরিণয় ফলে অন্য আর এক বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয় ;—ইহাদিগকে মূলাটো বলে। ব্রেজিলে মূলাটোর সংখ্যাও অতিশয় অধিক। এতদ্ব্যতীত পর্টুগিজ, জার্ম্মান্ প্রভৃতি ইউরোপীয় অনেক লোক এখানে অভিনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

পর্টুগিজগণ প্রথমে এদেশে রাজ্যস্থাপন করেন, পরে যখন নেপোলিয়ন্ পর্টুগাল-দেশ আক্রমণ করিয়া রাজপরিবারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, তখন রাজা সপরিবারে স্বদেশ-পরিত্যাগ করিয়া ব্রেজিলে প্রস্থান করেন। পর্টুগালের সহিত নেপোলিয়ানের সন্ধি হইলে রাজা আর দেশে ফিরিলেন না তিনি সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিয়া ব্রেজিলে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার জনৈক আত্মীয় আসিয়া পর্টুগালের রাজা হইলেন। তদবধি পর্টুগিজ সম্রাট্ই ব্রেজিলে রাজ্য করিতেছিলেন, পরে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া এক্ষণে ব্রেজিল্ সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে শাসিত হইতেছে।

যে দেশে সুরেশ গৃহবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বিবাহ করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, সে দেশের স্থূল বিবরণ তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভূবৃত্তান্ত-পাঠে ইহার কতকটা আভাসও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, দেশ যেরূপ উর্ব্বরা তাহাতে ইহাতে যদি সেইরূপ লোকের বসবাস থাকিত, তাহা হইলে জগতে ব্রেজিল্ ধনধান্যে একটী প্রধান দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত;—কিন্তু ইহা আকারে ইউরোপের ন্যায় হইলেও ইহার লোক-সংখ্যা অতি অল্প। দুই তিনটী সহর ব্যতীত আর সহর নাই, অধিকাংশ স্থলই ঘোর-জঙ্গলে পূর্ণ,—লোকালয়ের সম্বন্ধ নাই। এতবড় দেশে রেল্ একেবারেই ছিল না, সম্প্রতি কোন কোন স্থানে রেল্ হইয়াছে। ইহার প্রধান সহরের নাম রাইও ডি-জ্যানিরো এই নগরটী আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত, ইহার লোকসংখ্যা সাড়ে-তিনলক্ষের উপর নহে। এইটীই এ দেশের রাজধানী।

এক্ষণে সুরেশ এই নগরে আসিয়া তাঁহার অদ্ভুত-ক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। তিনি যে এ সময়ে কেবল সার্কাসই করিতেন এরূপ নহে। "লা ক্রনিকা" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি এই সময়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতাদিও প্রদান করিতেন। তিনি এই সকল বক্তৃতা যে কেবল ইংরাজীতে দিতে লাগিলেন, এমত নহে;—ব্রেজিলে তিনি ব্রেজিলের রাজভাষা পর্টুগিজে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিতে পারিতেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী, জার্ম্মান, স্পেনীয়, ফ্রেঞ্চ, পর্টুগিজ, ইটালিয়ন্, ডানিস্ ও ডাচ্ এই সাতটী ভাষায় অনায়াসে অতি সুন্দর কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অবসর পাইলেই তিনি পাঠে মনোযোগী হইতেন। অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন ও রসায়ন তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল; এই সকল শাস্ত্রে তিনি যে সাতিশয় দক্ষ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ, এই সময়ে

তিনি নানাস্থানে এই সকল বিষয়ের বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। নানা সংবাদপত্রে তাঁহার বিশেষ প্রশংসাও প্রকাশ হইয়াছিল। অভিনিবেশ থাকিলে শিক্ষার সময় কখনও শেষ হয় না এবং প্রতিভা আন্তরিক অনুরাগ থাকিলে অভীষ্টপথের অগণ্য বিঘ্ন অন্তরায় যে অচিরেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সুরেশচন্দ্রের জীবনে লক্ষ্য করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমরা একে একে দেখাইব, কত প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া, তিনি পরিশেষে ব্রেজিলে আপনার অবস্থিতির উপায় করিয়া লইয়াছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রেজিলের রাজধানীতে আসিলেন, ব্রেজিল-দেশ তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল;—ইহার প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া সুরেশ মুগ্ধ হইলেন। তিনি এই দেশে বাস করিতে মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। ঐকান্তিক অভিলাষ প্রায়ই অপূর্ণ থাকে না। তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুবিধাও ঘটিল,—এই সময়ে ব্রেজিল দেশের রাজকীয় পশুশালায় পরিদর্শক ও রক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছিল। সেই পদ পাইবার জন্য সুরেশ আবেদন করিলেন। সুরেশের ন্যায় পশুপালক ও পশুশিক্ষককে পাইবামাত্র ব্রেজিল-রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। তখন সুরেশ সার্কাস্ পরিত্যাগ করিয়া ব্রেজিলের পশুশালায় সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট্ হইলেন। কর্ম্মান্তর-গ্রহণে সুরেশচন্দ্র কখনও সঙ্কুচিত নহেন। জীবনে যাঁহার মমতা নাই—প্রাণের আশঙ্কা যাঁহার বাল্যকাল হইতেই দেখা যায় নাই, দুর্দ্দান্ত হিংস্রপশু-সিংহ-ব্যাঘ্র যাঁহার ক্রীড়া-সহচরমাত্র, কর্ম্মান্তর-গ্রহণে সঙ্কুচিত হইবার কারণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব!

---

# দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## নব-অনুরাগে সুরেশ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদিও সুরেশ হিংস্রক-পশু-বশীকরণ-কার্য্যেই শিক্ষিত হইয়াছেন বটে, তথাপি তিনি অবসর পাইলেই গণিত-শাস্ত্রাদি আলোচনায় নিযুক্ত হইতেন। বস্তুতঃ, এই সকল অনুশীলনে তিনি স্বভাবতঃ কেমন আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ ছিলেন, অঙ্ক ও অন্যান্য শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং লাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। দার্শনিক-তত্ত্ব ও গুপ্তবিদ্যানিচয়ে তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল, বিশেষতঃ ইন্দ্রজাল ও কিমিয়া বিদ্যায় তিনি সাতিশয় আশক্ত ছিলেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে সমধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া সুরেশ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র পাঠাগারে বসিয়া অনন্যমনে অধ্যয়নে রত থাকিতেন, অথবা কাচ-যন্ত্রাদি ও মুচি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় বিব্রত থাকিতেন! নিয়ত প্রধাবমান কালস্রোত কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, জানিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই সকল অধ্যয়নের সার-সংগ্রহ তাঁহার শেষ পত্রে আভাষ পাওয়া যায়! আত্মজীবনীতে এই সকল লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কল্পনা ছিল! ভগবান্ সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর দেন নাই!

ঘটনাক্রমে সুরেশের সহিত একদা স্থানীয় চিকিৎসক-কন্যার সাক্ষাৎ ঘটে! এই প্রথম সন্দর্শনেই তৎপ্রতি তাঁহার প্রেমের সঞ্চার হয়, কিন্তু উক্ত রমণী তখনও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন নাই। অনন্তর যথারীতি তাঁহারা উভয়ে উভয়ের সহিত পরিচিত হইলেন,—তাঁহার পক্ষে উহা

বাহুল্য বলিয়া প্রতীত হইল। যাহা হউক এই পরিচয়ের পর হইতে পথে, শকটে, বিপণিতে, উভয়ের সাধারণ বন্ধুগৃহে প্রভৃতি নানাস্থানে পরস্পরের প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত। ক্রমে ক্রমে তিনি সেই রমণীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রমণী সে সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না। পরে তিনিই আবার তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত ও শূন্য-অংশ পূর্ণ করেন!

স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ কল্পনা-বহুল বিচিত্র-জীবনের অনুরাগিণী; তজ্জন্যই দেখা যায় যে, সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই তাহারা বীরবিক্রমের পক্ষপাতী। সর্ব্ব-জাতির ইতিহাসেই ইহার প্রচুর উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে রমণীরা স্বয়ংবরা হইলে অনেক স্থলেই ধনবান্ অপেক্ষা নিঃস্ব ব্যক্তিকেই বরমাল্য প্রদান করে এবং এরূপ পরিণয়েই প্রায় দাম্পত্য-প্রেমে চিরসুখিনী হইয়া থাকে। সার্কাসের সেই জার্ম্মাণ রজ্জু-নর্ত্তকীর কথাই ভাবিয়া দেখুন না,—অভাগিনী এই অপরিচিত, নরভুক্জন্তু-সহবাসে আসন্ন-মৃত্যুমুখে স্থিত তাম্রবর্ণ ভারতবাসীর অঙ্কশায়িনী হইবার আশায়, জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু ভূম্যধিকারী যুবার অযাচিত পাণিপ্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছিল!

যদিও উক্ত চিকিৎসক-কন্যা প্রথমে সুরেশকে তৎপ্রতি অনুরাগ-প্রদর্শনে অণুমাত্রও উৎসাহ প্রদান করেন নাই, কিন্তু সে অটল-প্রকৃতি সিংহপালকের প্রার্থনা তিনি অধিক কাল অপূর্ণ রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই। সুরেশ এতাবৎকাল ভয় কাহাকে বলে, জানিতেন না,—অসংখ্য ভীতি-পূর্ণ আসন্ন-মৃত্যু অদ্যাপি তাঁহাকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। নানামূর্ত্তিতে মৃত্যু অদ্যাবধি তাঁহাকে নানা-বিভীষিকা-প্রদর্শন করিয়াছে,—মারী-ভয়ের ভীতি, ক্রীড়নশীল সর্প কুলের দংশনাশঙ্কা, শিক্ষিত ব্যাঘ্র বা সিংহ-নিচয়ের দংশন-ভয়, এবং তৎশিক্ষিত করিকুলের দশন ভীতি প্রভৃতি কিছুতেই তিনি অণুমাত্রও

শঙ্কিত হয়েন নাই। উপস্থিত প্রেমই তাঁহার জীবনের একমাত্র বন্ধন; যদি তাহাতে নিরাশ হয়েন, তাহা হইলে মৃত্যু তদপেক্ষা শতগুণে বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহার মনে হইত। এ সকল কথা: উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা-বাক্য নহে,—প্রকৃতই সুরেশের প্রণয়নী তাঁহার ঘটনাবৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতি ক্রমশঃ স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইলেন এবং সেই কারণেই সুরেশের প্রতি কথঞ্চিৎ পক্ষপাতীও হইয়াছিলেন। সুরেশের নির্ভীকতা, জীবনকে অতি সামান্য তৃণ অপেক্ষা লঘু-জ্ঞান, বিনা-দ্বিধায় কি নৃশংস ব্যাঘ্র, কি ভয়াবহ অহিকুল, কি ভীষণদন্ত বারণ কি তীব্রচক্ষুষ্মান্ ক্রূরমতি বন্য-মার্জ্জার (lynx) প্রভৃতি হিংস্রকজন্তুমুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভিষক্-দুহিতা বস্তুতঃই মোহিত হইয়াছিলেন। বিবিধ বন্যজন্তু তাঁহার সেই মোহিনী তীব্র-দৃষ্টি-প্রভাবে তাহাদের স্বাভাবিক হিংস্র ও দুর্দ্দান্তভাব ভুলিয়া নিমেষে গৃহপালিত-পশুদিগের মত শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার বশীভূত হইত! রমণী যে সে নয়নপ্রভাবে মুগ্ধ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

ক্রমে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে যতই ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইতে লাগিল, ততই রমণী স্বীয় পূর্ব্বগাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রমণী-জন-সুলভ লজ্জা ভারতের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোনও অংশেই পরিদৃষ্ট হয় না; স্পেন্ ও পর্টুগালবাসীদিগের মধ্যে অবশ্য কতক পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু ফরাসী ও মার্কিণদিগের মধ্যে আদৌ নাই। অদ্যাপি ব্রেজিলে মহিলাকুলের বাচালতা সামাজিক ব্যভিচার রূপে পরিগণিত হয়। ফলতঃ পুরুষদিগের সহিত অবাধে সংমিশ্রণ ব্রেজিল-বালাদিগের পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু অন্য কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশে এরূপ নিয়ম দেখা যায় না।

কিন্তু প্রেম নির্দ্দিষ্ট সমাজ-বন্ধনীর অধীন নহে;—নহিলে তুষার-

ধবল ডেস্‌ডিমোনা-সুন্দরী, কৃষ্ণকায় সুরেশের চরণতলে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার নারীজন্ম ও জীবন—সার্থক করিবার জন্য এত লালায়িত হইত না। মদনের মোহন শাসনের অপ্রতিহত প্রভাবে ক্রমে সেই সুদূর ভারতবাসী যুবক ও ব্রেজিলবাসী ভিষক-বালার হৃদয়-দুইটি একীভূত হইতে লাগিল। বালা প্রায়ই তাঁহাকে তাঁহার নানা-স্থানের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিতেন এবং সুরেশ যখন সেই সকল ঘটনাবলী অস্ফুটস্বরে ব্যক্ত করিতেন, তিনি উৎকর্ণ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। সেই সকল আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয়ে কত তরঙ্গ উঠিত, গণ্ডদেশ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত, চক্ষু বিস্ফারিত ও সমুজ্জ্বল হইত—তিনি যেন দেখিতেন, পৃথিবীতে আর কিছুই নাই; কেবল দেশে বিদেশে সুরেশচন্দ্র মহামহিমায় সৌন্দর্য্যে-বীর্য্যে সর্ব্বস্থানে কীর্ত্তিকলাপের বিজয়মালিকা পরিয়া দেবমূর্ত্তিতে চারিদিক্ আলো করিয়া আছে। তিনি অন্তরে, তিনি বাহিরে। তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে ভাষার অভাব হইত বলিয়া ভিষক্‌দুহিতা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে প্রিয়তমের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন ও দৃঢ়তর মুষ্টিতে সুরেশের কর পেষণ করিতেন।

---

# ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## কর্পোর‍্যাল্ সুরেশ

একদিন সেই ভিষক্-দুহিতা কথাপ্রসঙ্গে রহস্যচ্ছলে প্রকাশ করেন যে, সুরেশকে সৈনিক-সজ্জায় বোধ হয় বড়ই সুন্দর দেখায়, এই রহস্যবাক্য সুরেশের মনে গম্ভীর আদেশ বলিয়া প্রতীত হইল।

সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রণয়িনীর সমীপে স্বীয় অনুরাগ প্রমাণিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি সাগ্রহে সেনানীদলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সানন্দে কঠোর সামরিক নিয়মাবলী প্রতিপালনে নিরত হইলেন! সৈনিক দলভুক্ত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তিন-বৎসরকাল অবিচ্ছেদে তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য, এবং ইচ্ছা করিলেই এখন আর সেই পূর্ব্বের মত দেশপর্য্যটনে সক্ষম নহেন। একবার যখন তিনি নিয়মাবদ্ধ হইয়াছেন, তখন আর পলায়নের উপায় নাই,—কারণ, সর্ব্বদেশের সমর-নীতির কঠোর বিধান অনুসারে পলাতক-সৈনিকমাত্রেই কারাবাস বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে! বলা বাহুল্য যে, প্রণয়িনীর প্রেমপরীক্ষার্থই তিনি সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন,—অন্ততঃ তিনি নিজ-প্রণয়বেগও দেখাইতে পারিবেন। ফলে, তিনি দেখাইলেন যে, প্রণয়িনীর জন্য তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারেন, দ্রব-লৌহ গলাধঃকরণ করিতেও দ্বিধা করেন না। তিনি সামান্য সৈন্যরূপে প্রবেশ করেন, সৈনিক-জীবন সর্ব্বপ্রদেশেই সমক্লেশকর।

সুরেশ ১৮৮৭ সালের প্রারম্ভেই ব্রেজিল-সম্রাটের অধীনে সেনানী-পদে নিযুক্ত হইলেন। ব্রেজিলে তখনও এখনকার ন্যায় সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমপদস্থ সাধারণ সৈনিক-দিগের অপেক্ষা জ্ঞানে ও বিদ্যায় উন্নত ছিলেন; তিনি সাতটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং যদিও প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই, তথাপি যে তথাবিধ অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! তিনি স্বচেষ্টায় নানাবিধ অসামান্য বিদ্যা-অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন—সঙ্কটাপন্ন ও শ্রান্তিজনক ক্রীড়াবসানে যে অবসর পাইতেন, সেই সময়টুকু নানা-জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত করিয়া তৎসমুদায়ে

স্থব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও জাতি ও বর্ণের জন্য তাঁহার পদোন্নতির অন্তরায় ঘটিল—তাঁহার সম্বন্ধে ব্রেজিলেও বর্ণপার্থক্য বিষম প্রত্যবায় বলিয়া পরিগণিত হইল! কিয়ৎকাল তাঁহাকে সাধারণ অশ্বারোহী সেনানী-নিচয়ের কষ্টসমূহ ভোগ করিতে হইলে—স্বহস্তে স্বীয় অশ্বপরিচর্য্যা ও শস্ত্র-পরিষ্কার করিতে হইত।

দেখা যায় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাণ্টাক্রুজে ক্ষুদ্র একদল পদাতিক সেনানীর নায়করূপে কর্পোর‍্যাল্ পদে অধিষ্ঠিত। সাণ্টাক্রুজে সম্রাটের অশ্ব-চারণের একটি মাঠ ছিল, কর্পোর‍্যাল্ স্থরেশচন্দ্র তথাকার অশ্বরক্ষকদিগের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত হয়েন। এই স্থানে তিনি বহুদিবস অবস্থান করেন। এখানে তাঁহার বিশেষ কার্য্য কিছু ছিল না ;—পাঠ, রাসায়নিক পরীক্ষা এবং প্রণয়পাত্রীর প্রেমচিন্তায় কাল অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার প্রেমপুত্তলি যদিও সশরীরে সেথানে ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি স্থরেশের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। সে মূর্ত্তি প্রবাসে সঙ্গিনী, দুর্দ্দিনের সহচরী, অবসাদে সঞ্জীবনী ও জীবনের স্থখচিন্তা হইয়াছিল। যে রত্ন-লাভাশায় তিনি অশেষ অস্থবিধা-অন্তরায় উপেক্ষা করিয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, যে স্থানে জাতিবর্ণের বিষম-ব্যবধান তাঁহাদের স্থখসৌভাগ্যের বিশেষ অন্তরায় ছিল, মোহিনী প্রতিমার স্নেহশীতলস্পর্শ ব্যতীত তথায় কিসে তাঁহাকে সঞ্জীবিত রাখে ?

---

# চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## চিকিৎসা-বিভাগে সুরেশ

কিছুকাল পরে তিনি সাণ্টাক্রুজ্ হইতে রায়ো-ডি জেনেরোর সামরিক হাঁসপাতাল তত্ত্বাবধানে প্রেরিত হয়েন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন, তদ্ব্যতীত ইতঃপূর্ব্বেই পুস্তকাধ্যয়ন করতঃ চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি অস্ত্র-বিদ্যায় এরূপ সিদ্ধহস্ত হইলেন যে বিনা-দ্বিধায় ও নির্ভীক-চিত্তে অধিকাংশ অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পাদন করিতেন। অধিকন্তু চিকিৎসা-বিদ্যায় তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে তাহা সমাধিক বর্দ্ধিত হইল। বস্তুতঃ এই সময়ে এতৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার পিতৃব্যকে ও অন্যান্য দেশীয় বন্ধু-বান্ধবকে সানন্দে বহুসংখ্যক পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রকৃতই এই চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুশীলন যেন তাঁহাকে প্রণয়-পাত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে বলিয়া তাহার মনে হইত,—চিকিৎসক কন্যার চিকিৎসা-বিদ্যানুরাগ স্বতঃসিদ্ধ।

সুরেশের তিন-বৎসর সৈনিক-পদে নিযুক্ত থাকিবার চুক্তি বা অঙ্গীকার পত্র ১৮৮৯ সালের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইল! ইচ্ছা করিলে এক্ষণে তিনি রণবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া মনোমত অন্য কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন; কিন্তু এই তিন বৎসর-কাল একক্রমে সমর-বিভাগে নিয়োজিত থাকিয়া এবং কষ্টকর পদাদি অতিক্রম করিয়া তিনি এই বিভাগে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন আর সহসা এ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি অশ্বারোহী সৈন্য হইতে পদাতিক শ্রেণীতে পদপরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিলেন,

এক্ষণে অনতিবিলম্বে সেই শ্রেণীর বন্দুক চলাইবার প্রথা ও অন্যান্য কর্ত্তব্যনীতি সর্ব্বথা শিক্ষা করিলেন। স্থরেশ যদি নির্দ্দিষ্ট তিন বৎসর পরেই সমর-বিভাগ পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে জগদ্‌বাসী ব্রেজিল সৈন্যাধ্যক্ষ-রূপে জনৈক ভারতবাসীর অসম-সাহসিকতা এবং অগণ্য অরাতি-সৈন্য-বিপক্ষে অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী শুনিতে পাইতেন না। তিনি অস্ত্র-চিকিৎসক বা সিংহপালকরূপে কখনই এরূপ ভুবন-বিখ্যাত যশোলাভ করিতে বা এরূপ উন্নত-পদমর্য্যাদা-কীর্ত্তিকলাপে বিভূষিত হইতে সক্ষম হইতেন না; কিন্তু জগৎপিতা ইচ্ছাময়ের নির্দ্দেশ যে তিনি মেকলে প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচ্য-গ্রন্থকারগণের বাঙ্গালীদিগের কাপুরুষতা সম্বন্ধে শ্লেষবাক্য ব্যর্থ করিয়া নাথেরয়ের বিখ্যাত-যুদ্ধে স্বনাম-ধন্য হইবেন এবং জগৎ-সমক্ষে প্রতীয়মান করিবেন যে, যদিও ইংরাজ রাজা তাঁহাকে অস্ত্র-শস্ত্র-প্রদানে বিমুখ, তথাপি তিনি সম্রাট্ ও মাতৃ-ভূমির রক্ষার্থে তরবারি-ধারণে সম্যক্ ও উপযোগী। বাঙ্গালী-মাত্রেই ভীরু ও কাপুরুষ নহে। কার্য্যক্ষেত্রে পড়িলে তাহারা বজ্রনাদী কামানের মুখে অবলীলাক্রমে আগুয়ান হইয়া অরাতিক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইতে, রণরঙ্গে মাতিতে পারে এবং যে কোন দেশের সুদক্ষ সেনানায়ক ও সৈনিকদিগের সহিত সম-পরাক্রমে আপনাদের বীরবিক্রম দেখাইতে পশ্চাৎপদ নহে।

ব্রেজিলিয়ান্ সেনানীমণ্ডলীর মধ্যে স্থরেশ যে উচ্চপদলাভে সম্মানিত হইবেন, ইহাই বিধাতার বিধান; সময়ে তাহাই ঘটিল। যদিও এক্ষণে তিনি কর্‌পোরালের পদমাত্র লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক্ষণে বহু-অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হওয়ায় ব্রেজিলিয়ান্ ভদ্রসমাজে তাঁহার যথেষ্ট মান-সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি-লাভ ঘটিয়াছিল।

যখন তিনি ব্রেজিলের রাজধানী রায়ো-ডি-জেনেরো নগরের হাঁস-পাতালে কাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মার্কিণদেশের মারাত্মক ব্যাধি

পীতজ্বরের প্রবল-প্রকোপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। তাহার উপর এই সময়ে দেশে এক ঘোর-বিপ্লব উপস্থিত হইল; চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল,—প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক আহত হইয়া হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থে আসিল। একদিকে পীতজ্বর-পীড়িত লোকের কাতরোক্তি,—অন্যদিকে আহতগণের আর্ত্তনাদ। হাঁসপাতাল দিন দিন ভীষণ-ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা হাঁসপাতালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা যে কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সুরেশ এই সময়ে এই হাঁসপাতালের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মুমূর্ষুগণের আর্ত্তনাদের মধ্যে ও শব-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন;—কিন্তু তিনি একদিনও কর্ত্তব্যবিমুখ হয়েন নাই,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয় কম্পিত হয় নাই। বীরসাহসে ও বীর উদ্যমে তিনি হাঁসপাতালের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

---

# পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## সার্জ্জেণ্ট্ সুরেশ

সুরেশ ক্রমে কর্‌পোর‍্যালের পদ হইতে উন্নীত হইয়া পদাতিদলের প্রথম সার্‌জেণ্টের পদলাভ করিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, যদিও সেনানী-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার সমপদস্থ সৈনিকপুরুষদিগকে যেরূপ কার্য্য দেওয়া হয়, তাহাপেক্ষা তাঁহাকে সমধিক গুরুতর ও উচ্চপদস্থ সৈনিক-পুরুষের কাজ দেওয়া হইত, তথাপি তিনি কৃষ্ণকায় ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার

পদোন্নতির নানা প্রকার ব্যাঘাত ও অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। যদিও তিনি অনেক বীরোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, রাজ্যের অশেষ উপকার-সাধন করিয়াছিলেন, সর্ব্বকর্ম্মে বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন ও রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক প্রসংসিত হইয়াছিলেন,—তথাপি চারি বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন পদোন্নতি হয় নাই। তিনি যে সার্জেণ্ট, সেই সার্জেণ্টই ছিলেন। সে সময় দেশব্যাপী বিপ্লব চলিতেছিল, তখন প্রায়ই তাঁহাকে এই সকল যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইত; তিনি সেই সকল যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দেন; এবং তাঁহার উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষগণ তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার কোনরূপ পদোন্নতি ঘটিল না! তিনি যে পদে ছিলেন, তাহাতে তিনি কেবল অল্পসংখ্যক সৈনিকদল-পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁহার অসীম সাহস ও বীরত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত,—অন্যান্য সৈনিকগণ তৎপ্রতি ঈর্ষান্বিত হইত; তবে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিত না! সুদূর হিন্দুস্থানস্থ গঙ্গাতীরবাসী কৃষ্ণকায় বাঙ্গালী যুবককে সকলেই ভয় করিত।

---

# ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্থরেশ

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম-লেফ্‌টেন্যাণ্টের পদ পাইলেন। এই পদ নিতান্ত সামান্ত বা নগণ্য নহে; ফলে, ইঁহা রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় পদ। এই পদ পাইয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি একটা সেনাদলের অধিনায়ক হইলেন; কিন্তু সহজে তিনি এ পদ পান নাই। দেশে এই সময় ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ব্রেজিলের নৌসেনানীমণ্ডলী বিদ্রোহ-পতাকা তুলিয়া রাজধানী রায়ো-ডি-জেনিরো অবরোধ করিল। মহা-ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিল। এই সময়ে স্থরেশ তাঁহার পদোন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার খুল্লতাতকে যাহা লিখিয়াছিলেন—আমরা এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিব।

"খুড়া মহাশয়! আমি এক্ষণে যে পদ লাভ করিয়াছি, ভাবিবেন না, আমি ইহা সহজে পাইয়াছি। আমি যে এ দেশের সেনানীমধ্যে একজন সেনাপতি হইব, ইহা আমি কথনও ভাবি নাই। অনেক সময়েই আমার পদোন্নতির কথা উঠিয়াছে এবং প্রত্যেকবারেই আমার নাম চাপা পড়িয়াছে,—আমি বিদেশী বলিয়া আমার পদোন্নতিতে প্রত্যেকবারেই ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। সম্প্রতি দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে,—আমি ও আমার সমপদস্থগণ একজন প্রধান-সেনাপতির অধীনস্থ হইয়াছি। ইনি আমাকে চিনিতেন না, কিন্তু ইনি ন্যায়বান্‌ ব্যক্তি,—লোকের গুণ-গ্রহণে বিরত নহেন। আমি কোন্‌ দেশবাসী, আমি কে, ইনি তাহা একবারও দেখেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি আমার সাহস ও দক্ষতা দেখিয়া প্রীত হইয়া আমার পদোন্নতির জন্য রাজপুরুষদিগকে লিখিয়াছিলেন,—তাহাতেই আমার পদোন্নতি ঘটিয়াছে। তিনি আমার সম্বন্ধে এদেশের মার্শাল্‌ ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্টকে বিশেষরূপে

লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি লেফ্‌টেন্যাণ্টের পদলাভ করিয়াছি। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, আমি লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ হইয়া নাথেরয় নামক স্থানে যে ঘোর-যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, আমাদেরই জয় হইয়াছে।”

সুরেশ লিখিয়াছেন,—“আমি এই পত্রের সহিত নাথরয়ের যুদ্ধের এক চিত্র পাঠাইতেছি। নাথরয়ে আমার নিম্নস্থ সৈনিকগণ সকলেই আমাকে বিশেষ ভয় করিত;—কেন করিত, বলা যায় না,—আমি তাহাদের কাহারও প্রতি কখনও নির্দ্দয় ব্যবহার করি নাই। আপনারা সকলেই লেখেন যে, যুদ্ধের বিশেষ বর্ণনা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইবে,—কিন্তু কাকা! কি লিখিব? যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা আমি আপনাকে কি লিখিব! যে জীবন জগতে সকল অপেক্ষা প্রিয়, যুদ্ধে সেই জীবন ক্রীড়াদ্রব্যরূপে লোকে অনায়াসে বিসর্জ্জন করে। সাহস আর কাহাকে বলে! যুদ্ধক্ষেত্রে স্থিরচিত্তে প্রাণদান করার নাম, বা প্রাণদান করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার নামই সাহস।”

“যখন শত্রুগণ দূরে অবস্থান করে, তখন তোমার বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তোমার দক্ষতা, সাবধানতা, তোমার ও আমার অধীনস্থ সেনানীমণ্ডলীর পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে। কিন্তু যখন শত্রুগণ সন্নিকটে আগত, পরস্পরের সংঘর্ষ উপস্থিত, তখন কেবল সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন, অন্য কিছুই কার্য্যকরী হয় না। যে পক্ষ বিপুল সাহসে নির্ভর করিয়া শত্রু আক্রমণ করিতে পারে,—সেই পক্ষেরই জয় হয়। শত্রুগণ সেই পক্ষের অত্যধিক উদ্যমে ও সাহসে ভীত ও বিচলিত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে।”

এই সকল কথা প্রকৃতই বীরোচিত। প্রকৃত বীর-হৃদয় না হইলে কেহ কখন অপরকে কুকুরের ন্যায় নিজ পদানুসরণ করাইতে পারে না! অন্যকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাওয়া সহজ কার্য্য নহে,—স্বীয় প্রকৃতির প্রকৃত

উন্মাদিনী শক্তি না থাকিলে কেহ কথনই পরকে প্রাণ হারাইতে উত্তেজিত করিতে পারে না! স্থুরেশের এই শক্তি না থাকিলে বিদেশীয়, বিজাতীয় সৈনিকগণ ঘোর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আসন্ন-মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইত না! উদাহরণ-স্বরূপ একটা সামান্য ঘটনা বলি,—যখন স্থুরেশ সণ্টাক্রুস্ নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় ব্রেজিল দেশীয় একজন অধিবাসী তাঁহার গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সে কেবল স্থুরেশের নিকট থাকিতে পারিবে বলিয়াই উক্ত সৈন্যদলে নাম লেখাইয়াছিল।

---

# সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## দাম্পত্যপ্রেমে স্থুরেশ

নাথেরয়ের যুদ্ধ-বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আমরা এখানে স্থুরেশের গৃহস্থালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, স্থুরেশ রায়ো-ডি-জেনিরো নগরে আসিয়া তথাকার জনৈক ভিষক্-দুহিতাকে ভালবাসিতেন। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি এই দেশের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের কন্যা,—ইহাঁকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়াই স্থুরেশ সৈন্যদলে সামান্য সৈনিকরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রমণীও তাঁহার গুণ-গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি আত্মত্যাগ অনুভব করিয়াছিলেন। যদিও তিনি তদবধি স্থুরেশকে বহুকালযাবৎ দেখেন নাই, যদিও দেশের নানা সম্ভ্রান্ত যুবক তাহার পাণিগ্রহণার্থে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তবুও রমণী তাঁহাকে একদিনের জন্যও ভুলেন নাই। তিনি সেই সুদূর ভারতবাসী, অপরিচিত হিন্দু-যুবকের মূর্ত্তি সর্ব্বদাই হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিতেন! যাঁহার



মিসেস্ সুরেশ বিশ্বাস

দেশ কোথায়, তাহা জানেন না ;—যাঁহার আত্মীয়-স্বজন কিরূপ, তাহা অবগত নহেন,—তিনি তাঁহাকেই চিরজীবনের জন্য হৃদয়-আসনে বসাইয়াছিলেন ! বহুকাল পরে সুরেশ যখন যশোমান লাভ করিয়া লেফ্-টেন্যাণ্ট্রূপে রায়ো-ডি-জেনিরো নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন আবার সেই দীর্ঘ-বিরহ-কাতর, মিলন-ব্যাকুল হৃদয় দুইটি একত্র হইল। এত দিনে উভয়ের বহুকাল-পোষিত আশা সার্থক হইল, এত দিনে উভয়ে শুভ-পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। মহা-সমারোহে এই বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। নগরের সমগ্র সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিগণ এই বিবাহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। যদিও এক্ষণে সুরেশ স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজন হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত, তথাপি তাঁহার বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। তিনি সর্ব্বদা সম্ভ্রান্ত-সমাজে মহাসমাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। রায়ো-ডি-জেনিরো নগরে লামোস্ নামক একজন মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন,—ইনি তত্রত্য একজন প্রধান জমিদার ও ধনী। ইঁহার সহিত সুরেশের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। প্রকৃতপক্ষেই লামোস্ সাহেবই ব্রেজিলপ্রদেশে তাঁহার প্রধান-বন্ধুমধ্যে গণ্য। এই সকল বন্ধুদিগের মধ্যে বসবাস করিয়া সুরেশের দেশের অভাব,—আত্মীয়-স্বজনের অভাব,—কোনও কষ্টই উপভোগ করিতে হয় নাই। সকলেই সর্ব্বদা তাঁহাকে বাধিত করিতে ব্যগ্র হইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সুরেশ ব্রেজিল প্রদেশে বিশেষ-প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন।

সুরেশ সস্ত্রীক ব্রেজিলদেশে বড়ই সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহাদের যেরূপ দাম্পত্যপ্রণয় ছিল, তদ্রূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এক বৎসর পরে তাঁহাদের গৃহে শিশুর আনন্দময় হাস্যরোলে প্রতিধ্বনিত হইল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে সুরেশের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। এক্ষণে এই পুত্রের বয়স প্রায় একবিংশ বৎসর।

---

# অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## নাথেরয়-যুদ্ধে সুরেশ

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেজিল্‌প্রদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। যদিও এ প্রদেশে ষড়্‌যন্ত্র, গৃহবিবাদ ও কলহের আগার, তথাচ এরূপ বিপ্লব এতদঞ্চলে কদাপি হয় নাই। সমগ্র রাজ্য, সমস্ত প্রদেশ আলোড়িত হইয়া উঠিল,—অধিবাসিগণ বিব্রত হইয়া পড়িল! দেশের সমুদয় রণপোতে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীয়মান হইল! বিশখানি বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ আসিয়া রাজধানীর উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল! ব্রেজিলের স্থলসৈন্য অপেক্ষা রণপোতের সেনানীগণ অধিকতর শিক্ষিত ও দক্ষ ছিল, কাজেই প্রথমতঃ তাহারাই প্রতি-পদে জয়ী হইতে লাগিল,—সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল! অধিবাসিগণ চারিদিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। আইন-কানুন, শান্তি-সুখ সমস্তই এককালে লোপ পাইল। চারিদিকে অরাজকতা বিস্তারিত হইল।

যাহা হউক, কোনক্রমে দুর্গ-সকল যুদ্ধোপযোগী করিয়া, বহুসংখ্যক লোককে সখের সৈনিকরূপে নিযুক্ত করিয়া, বিদ্রোহী রণপোতের সৈনিক-গণ যাহাতে নগর অধিকার করিতে না পারে, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে আয়োজন করা হইল। যুদ্ধপোত হইতে অজস্র গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, স্থলস্থ দুর্গবাসিগণও নিশ্চিন্ত নীরব রহিল না। প্রত্যেক দুর্গের প্রত্যেক কামান অনর্গল অগ্নি উদ্গিরণ করিতে লাগিল। একদিকে রণপোতের বজ্রনাদ গোলা-নিচয় নগরে পতিত হইয়া গৃহ-অট্টালিকাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিল,—অন্যদিকে দুর্গস্থ গোলারাশিও সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। এইরূপে কয়েকদিন মহাসমর চলিতে লাগিল।

সুরেশ এ যুদ্ধে সর্ব্বদা উপস্থিত। তাঁহার উপর একদল সেনা-পরিচালনা করিবার ভার ছিল। তিনি সেনাপতির অধীনে থাকিয়া অসীম-সাহসে ও বিশেষ দক্ষতা-সহকারে যুদ্ধ-পরিচালনা করিতেছিলেন। নির্ভীকতা ও ক্ষিপ্রকারিতায় সে সময় বোধ হয়, ব্রেজিল-সেনানীগণ মধ্যে সুরেশের সমকক্ষ আর কেহই ছিলেন না।—প্রতি মুহূর্ত্তে ও প্রতি দিবসেই এইরূপে ক্রমান্বয়ে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল! রণপোতের সৈনিকগণ ভাবিয়াছিল যে, স্থলস্থ সৈনিকগণ কোনক্রমেই যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারিবে না। এক্ষণে ক্রমেই বুঝিল যে, তাহাদের সে ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। ব্রেজিল্-সৈনিক মহোৎসাহে ও বিশেষ-দক্ষতা ও সাহসসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিদ্রোহি-জাহাজ হইতে প্রত্যহই নগর আক্রমণের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু প্রত্যহই তাহারা বাধা পাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া জাহাজে ফিরিতে লাগিল।—তথাপি কিন্তু সহরের উপর গোলাবৃষ্টি কোনক্রমেই থামিল না, উভয়পক্ষেই অগ্নিক্রীড়া চলিতে লাগিল। কোনও রূপে নগর অধিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া রণপোতস্থ সৈনিকগণ নগর আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়া নগরের নিকটস্থ নাথেরয় নামক সহরতলীস্থ ক্ষুদ্র নগর অধিকারে কৃত-সঙ্কল্প হইল।

সেণ্টাক্রুস, বাগ, সানসাকো প্রভৃতি নগরের পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গসকল ক্রমান্বয়ে গোলাবৃষ্টিতে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছিল,—কিন্তু তবুও ব্রেজিলের রাজপুরুষগণ ভীত হন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিয়া দেশরক্ষার্থ প্রস্তুত ছিলেন। উভয়পক্ষ হইতেই সৈন্যগণ স্থানে স্থানে সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল,—কিন্তু কোন পক্ষই জয়ী বা পরাভূত হয় নাই। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতেছিল।

তাহারা প্রথমে ইহার উপর অনর্গল গোলাবৃষ্টি করিয়া পরে একযোগে বহুসংখ্যক সেনা এই ক্ষুদ্র নগর আক্রমণ করিতে

প্রেরণ করিল। এই নগররক্ষার্থে স্বরেশ সদলে উপস্থিত ছিলেন। যখন নগরে গোলাবর্ষণ হইতেছিল, তখন তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই,—কেবল যাহাতে তাঁহাদের কামানের গোলা ঠিক জাহাজে গিয়া না পড়ে, তাহারই চেষ্টা করিতেছিলেন,—অন্য কিছুই করিবার উপায় ছিল না,—কারণ, হাতাহাতি সম্মুখ-যুদ্ধ না হইলে স্বরেশ নিজের সাহস ও দক্ষতা কিছুই দেখাইতে পারিতেছিলেন না,—কিন্তু শীঘ্রই এ স্থবিধা ঘটিল।

যখন বিদ্রোহিগণ ভাবিল যে, নাথেরয় সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হইয়াছে, তখন তাহারা বিজয়োৎফুল্ল হইয়া বহুসংখ্যক সেনানী জাহাজ হইতে তীরে অবতীর্ণ করাইয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে ঐ ক্ষুদ্র নগর আক্রমণ করিতে প্রয়াস পাইল। তখন নাথেরয়ের রক্ষার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। উভয়দিক্ হইতেই আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা নিতান্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন;—একে ঘোর অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে শত্রু-পরিবেষ্টিত; কে শত্রু, কে মিত্র, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব! বিদ্রোহী সৈন্যগণ নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণস্থলে সৈন্যগণকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। তিন-ঘণ্টাকালব্যাপী এইরূপ তুমুল সংগ্রাম চলিল। উভয় পক্ষেই শত শত হত ও আহত হইল। বিদ্রোহী সৈন্যগণ এরূপভাবে ক্ষিপ্তের ন্যায় নাথেরয়ের রক্ষকদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহা-দিগের প্রাণরক্ষা করিয়া তথা হইতে অপসৃত হওয়া দুরূহ হইয়া পড়িল। বিদ্রোহিগণ নগরের এক দিক্ অধিকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিতে না পারিলে নগর-রক্ষার আর কোন আশাই নাই! অথচ সেই কার্য্য স্বসম্পন্ন করিবার জন্য অধিকসংখ্যক সেনা প্রেরণ করিবার উপায়ও তাঁহার ছিল না। এইরূপে যুদ্ধ জয়ের আশায় সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া প্রধান সেনাপতি

কেবলমাত্র ৫০ জন সৈন্ত লইয়া কোন সেনায়ক স্বীয় অধীনস্থ সেনাপতিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? সর্ব্বাগ্রে সুরেশ অতি আনন্দের সহিত এই কার্য্য করিতে প্রস্তুত বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন; এবং সঙ্গে কেবল-মাত্র ৫০ জন সৈনিক লইয়া শক্রদিগকে দূরীভূত করিতে অগ্রসর হইলেন। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, চন্দ্রমা ক্রমে মলিন হইয়া আসিতে-ছেন, এমন সময় ৫০ জন সাহসী বীর লইয়া বঙ্গবীর সুরেশ ভগ্নাবশেষ নাথেরয় নগর হইতে বহির্গত হইয়া, যে স্থানে বিদ্রোহী সেনাগণ অবস্থিত ছিল, সেই দিকে বিপুল-বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। অন্ধকারে শক্রপক্ষীয়গণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?" সুরেশ বীরদর্পে উত্তর দিলেন, "আমরা ব্রেজিলদেশীয় সাধারণ-তন্ত্রের বীরসেনানী।" "অস্ত্র পরিত্যাগ কর, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও," এই বলিয়া বিদ্রোহী সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুরেশ তখন সদর্পে উত্তর করিলেন, "সাধারণ-তন্ত্রের বীরসেনানী অস্ত্র-পরিত্যাগ কাহাকে বলে, তাহা জানে না" এবং নিজের সৈন্যগণের নিকট গিয়া আপন মস্তকস্থ উষ্ণীষ ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া ক্ষিপ্ত-সিংহের ন্যায় শক্রগণকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহারা এরূপ ভীষণভাবে গুলি চালাইতে লাগিল, সুরেশের সৈন্যগণ সেই আক্রমণের বিপক্ষে আর বুঝি তিষ্ঠিতে পারে না! তাহারা আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং প্রায় পশ্চাৎপদ হইবার উপক্রম করিল। তখন সুরেশ রোষকষায়িত-নয়নে নিজ সৈনিকদিগের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া যুদ্ধের সেই মহাঘোর কলরবের উপর অভ্রভেদি-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সঙ্গিগণ, শক্রগণ নিকটে অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে, ব্রেজিলের সাহসী সন্তানগণ মৃত্যুভয়ে কখন ভীত নহে, এবং তোমরাও দেখিবে যে, পবিত্রভূমি হিন্দুস্থানের

সন্তান কেমন করিয়া এই সকল কামান অচিরাৎ অধিকার করিয়া লইবে ; প্রস্তুত হও, অনুসরণ কর।"

সুরেশ উচ্চৈঃস্বরে অনুচরবর্গকে কহিলেন, "আমার অনুসরণ কর ;" এবং তৎক্ষণাৎ স্বয়ং শত্রুদলমধ্যে ভীমবেগে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে সুরেশ আর একাকী নহেন, সহচরবর্গও সঙ্গে সঙ্গে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল যে, বিদ্রোহিগণ সেই আক্রমণবেগ আর সহ্য করিতে পারিল না। এই দুর্ব্বার আক্রমণ সেই চিরস্মরণীয় ব্যালাক্লাভার ন্যায় ভীষণ ও ঘোরতর ব্যাপার হইয়াছিল! শত্রুগণ তখন রণে ভঙ্গ দিল, কিন্তু সুরেশ ও তাঁহার অনুচর সৈন্যদল অমিততেজে বীর-বিক্রমে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে কেবল শত্রুদিগকে ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; গোলন্দাজদিগকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানেই বর্শা ও ছোরার আঘাতে বিনাশ করিলেন। হত্যাকাণ্ড অতি ভীষণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই যুদ্ধকাণ্ডেই সাধারণতন্ত্রীয় সেনাদল জয়লাভ করিল! স্বদেশ হইতে সহস্র সহস্র যোজন দূরে থাকিয়া, বিজাতীয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া বিদেশীয় রাজ্যের সেনানায়ক হইয়া, সুরেশচন্দ্র যে ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এমন ভারতবাসী কে আছে যে, তাহাতে আনন্দিত এবং গৌরবান্বিত হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান না করিবে? সুরেশ যে গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

লেফ্‌টেন্যাণ্ট বিশ্বাসের সেই অদ্ভুত আক্রমণেই যে জয়লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি! কিন্তু পরবর্ত্তী সমস্ত দিন খণ্ডযুদ্ধ ও মারামারি কাটাকাটি চলিতেছিল এবং তাহাতেও অনেক বিদ্রোহী বন্দী হইয়াছিল।

সমস্ত দিনের সেই ঘোরতর ক্লেশ ও পরিশ্রমের পর সায়ংকালে

সুরেশ দশজন বন্দীর সহিত শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া, ক্ষণকাল বায়ু-সেবনে স্নিগ্ধ হইবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এইরূপে একাকী বেড়াইতেছেন ইতিমধ্যে সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী একটি রমণী তাঁহার সম্মুখীন হইল। স্ত্রীলোকটি ভদ্রবংশীয়া বলিয়া বোধ হইল। মৃত ব্যক্তিগণ কোথায় পতিত আছে, ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য। স্ত্রীলোকটি বোধ হয়, কোন আত্মীয় ব্যক্তির মৃতদেহ অনুসন্ধান করিতেছিল। তাঁহার সৈন্যগণ যেস্থানে ছিল, তিনি রমণীকে আগ্রহের সহিত তাঁহারই অদূরবর্ত্তী গোরস্থানে লইয়া গেলেন। সহসা দুইজন বিদ্রোহী নৌসেনা চন্দ্রালোকোদ্দীপ্ত কৃপাণ হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সুরেশ মুহূর্ত্তমধ্যে কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া তাহাদিকে আক্রমণ করিলেন, শত্রুগণ তাঁহার সহিত রণরঙ্গ সামান্য-ব্যাপার নহে বুঝিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে পলায়ন করিল। নিস্তব্ধ রজনীতে সেই জনশূন্যস্থানে তাহাদিগের অনুসরণ করায় বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া যখন তিনি প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নাসিকায় সেই স্থানের দুঃসহ দুর্গন্ধে মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তজ্জন্য শরীর এতই অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, এক পদও চলিতে না পারিয়া অগত্যা নিকটস্থিত কোন প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া পড়িলেন। পরে স্বীয় অবস্থা পর্য্যালোচনাকালে পদভাগে শৈত্য অনুভব করিলেন। সুরেশ নিজের পত্রে লিখিয়াছেন যে, "ঐ শৈত্য যেন চরণ হইতে ক্রমশঃ বুকে উঠিল ; পরে ঠিক যেন সেইরূপ শৈত্য কর্ণে অনুভূত হইল, এবং তাহার মুখের উপর দিয়া ক্রমে বুকে আসিল। তাহার পরে তিনি অবশ ও অচৈতন্য হইয়া শত্রু বা দস্যুর কৃপাপাত্র হইয়া পড়িয়া রহিলেন।" এইরূপ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হইলে, তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন।

ইতোমধ্যে দুই জন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে অর্দ্ধ-উলঙ্গাবস্থায় হাঁসপাতালে লইয়া যায়। তথায় তিনি অষ্টাহকাল এতদবস্থায় ছিলেন ;

এবং স্থানীয় ডাক্তারও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বস্থানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে কয়েকদিন অদৃশ্য হওয়াতে তাঁহার বন্ধুবর্গ মনে করিয়াছিল যে, হয় ত কোন দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এমন কি, অনেকে তাঁহার পত্নীকে শোক-প্রশমনের সহানুভূতি পত্রও লিখিয়াছিলেন! কয়েক দিবস পরে আবার যখন তিনি দেখা দিলেন, তখন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার মধ্যে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

---

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

## উপসংহার

এই বিস্ময়কর ও বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবনীতে আমাদিগের বলিবার বিশেষ কিছুই নাই,— বিশেষতঃ চিরপ্রসিদ্ধ ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে অধুনা এরূপ কয়জন দেখা যায়? সুবিখ্যাত নাথেরয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই স্থরেশ পদাতিক সৈন্যদলের প্রথম লেফটেন্যাণ্ট পদলাভ করিয়া অবধি কেবল যে নানা যুদ্ধবিগ্রহেই নিযুক্ত ছিলেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ বৈষয়িক বিষয়েও ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। কালে সুরেশচন্দ্র রায়ো-ডি-জেনিরো নগরীমধ্যে সুকুমারমতি পুত্রকন্যা-পরিবৃত একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় একুশ বৎসর। অধুনা সামাজিক ও আর্থিক, কোন বিষয়েই তাঁহার অভিযোগের বা অসন্তোষের বিশেষ কোন কারণ ছিল না। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সুরেশচন্দ্র

সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ ও প্রবাহে ওতপ্রোত হইয়া শেষ জীবনে সুখ-সম্পদ্-যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের তৃপ্তিভোগ করিয়াছিলেন। কুজ্ঝটিকা ও প্রবল-বাত্যার অবসানে স্থিরবায়ু ও নির্ম্মল-গগন অথবা মহাবিপ্লবের পর শান্তির অবস্থা সদৃশ সুরেশচন্দ্র শেষে বিমল আনন্দ ও অতুল ঐশ্বর্য্যরাশির মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু এস্থলে আমাদিগকে বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, ইদানীন্তন লেফ্‌টেন্যাণ্ট সুরেশ সম্বন্ধে আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, পত্রাদিও লিখিতেছি, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাইতাম না। যে সকল পত্র আমরা তাঁহাকে লিখিতাম, তৎসমুদায় পুনরায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিত! কিন্তু ইহার অর্থ কি, তাহা আমরা তখন বলিতে বা অনুমান করিতেও পারি নাই। তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তখনও ব্রেজিলদেশীয় সেনানীমধ্যে অলঙ্কার-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন এবং অধিকতর পদমর্য্যাদালাভ করিয়া থাকিবেন। ফলে তিনি ক্রমে "কর্ণেল" পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বিগত তিন বৎসর ধরিয়া যে সকল চিঠিপত্র সুরেশের নামে প্রেরিত হইয়াছিল, ব্রেজিলের ডাকবিভাগ তাহা ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। অবশেষে রায়ো ডি-জিনিরোর বৃটিশ কৌন্সেলের নিকট অনুসন্ধানফলে জানা যায় যে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা এ স্থলে মিঃ পুনাণ্ডো লিমস নামক সুরেশের একজন স্থানীয় বন্ধুর একখানি পত্র উদ্ধৃত করিলাম। এই পত্রখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, সুরেশ কিরূপ বীরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং শত্রুগণ যে বাঙ্গালীর কুৎসা করিয়া থাকে—বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিয়া থাকে, তাহাও বিদূরিত হইবে! সুরেশের বীরত্ব ও সমর নিপুণতা দেখিলে বাঙ্গালী যে জগতে নিন্দিত ও ঘৃণিত, সে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হইবে। বিলাতের সুবিখ্যাত প্রাচীন ও ক্ষমতাশালী, বাঙ্গালী-বৈরি

টাইমস্ নামক পত্রও স্বীকার করিয়াছেন যে, যে বাঙ্গালী জাতি এক সময়ে—এক যুগমধ্যে স্বরেশ বিশ্বাস, জগদীশ বসু এবং অতুল চট্টোপাধ্যায় প্রসব করিতে পারে, সে জাতিকে কিছুতেই ঘৃণা করা যাইতে পারে না।

উল্লিখিত মিঃ পুনাণ্ডো লিমস ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে স্বরেশচন্দ্রের পিতাকে এই পত্র লিখিলেন,—তিনি ব্রেজিলের একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, সুতরাং তাঁহার লেখনী-প্রসূত কথাগুলি যে অতীব মূল্যবান্, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই বলিয়াই আমরা সে পত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

রাইয়ো-ডি-জেনিরো, ১২ই মার্চ্চ, ১৮৯৪।

"প্রিয় মহাশয়!

আপনি ইতিপূর্ব্বে বোধ করি, নিশ্চয় জানিয়া থাকিবেন যে, আপনার পুত্র ব্রেজিল গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী। ব্রেজিলের পদাতি সৈন্যদলের তিনি প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট ; সম্প্রতি নাথেরয়ের ( Nitheroy ) যুদ্ধে স্বীয় অদম্যবীর্য্য, উৎসাহ ও রণকুশলতায় তিনি বিপুল যশস্বী হইয়াছেন। সেই সুবিখ্যাত ভীষণ যুদ্ধ রজনীতে শত্রুগণ ছয়ঘণ্টাকাল অবিরত উক্ত নগরীতে গোলাবর্ষণ করিলে, আমাদিগের পরমবন্ধু, আপনার পুত্র, সৌভাগ্যবশতঃ সেইস্থলে স্বীয় সেনাদলের সহিত উপস্থিত থাকায় ৫০ জন সৈনিক সমভিব্যাহারে তিনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হয়েন। শত্রুপক্ষীয়গণ শীঘ্রই তাঁহাকে চিনিতে পারে এবং 'কে আসিতেছে?' পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। সে কথার প্রত্যুত্তরে তন্মুহূর্ত্তেই ধ্বনিত হইল, 'সাধারণ-তন্ত্রের বীর সৈন্যগণ'। পুনরায় শত্রুপক্ষ কহিল, "হয় আত্মসমর্পণ কর, নতুবা মৃত্যু নিশ্চয়।" তদুত্তরে তিনি কহিলেন, "সাধারণ তন্ত্রের বীরসৈনিকগণ বিনাযুদ্ধে কখন আত্মসমর্পণ করে না।" অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে

শত্রুগণের প্রতি সমধিক বেগে ধাবমান হইতে আদেশ করিলেন। শত্রুগণ তাহাদিগের কামান লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র ক্ষণতরে দণ্ডায়মান হইলেন এবং স্বীয় সৈনিকদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "সঙ্গিগণ,—শত্রুদিগের রিভলভার কামান আছে এবং উহা আমাদিগের অতি সন্নিকটেই স্থাপিত। আমি জানি যে, আমাদিগের প্রিয়ভূমি ব্রেজিলের বীরপুত্রগণের হৃদয় মৃত্যুভয়ে কদাপি আকুল হয় না, এবং তোমরা ইহাও দেখিবে যে, পবিত্র ভূমি হিন্দুস্থানের সন্তান কেমন করিয়া পাঁচ মিনিটকালমধ্যে শত্রুপক্ষের ঐ সকল অস্ত্র অধিকার করিয়া লইতে পারে; অতএব প্রস্তুত হও।" অনন্তর কয়েকবার আনন্দসূচক "হুরে" ধ্বনি করতঃ স্বীয় সহচরগণকে অনুসরণ করিতে বলিয়া ভীমবেগে শত্রুর কামানের মুখে তিনি আগুয়ান হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বাস্তবিকই তিনি কামানগুলি অধিকার করিয়া লইলেন; পরে ভীষণ কাটাকাটি আরম্ভ হইল এবং পরিশেষে তিনিই জয়লাভ করিলেন।

বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অবধি নাথেরয়-যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ( সুরেশ ) আমাদিগের কাছেই ছিলেন; কারণ, তিনি আমাদিগের পরিবারবর্গের বিশেষ আত্মীয়। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গতাসু হইলে আমি যেন এই মর্ম্মে কলিকাতায় একখানি পত্র লিখি যে, তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই যশস্বী হইয়াছেন, এবং যেন তাঁহার পুত্র তাঁহার কীর্ত্তি ও যশের কাহিনী জানিতে পারে এবং পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া তৎপথ অনুসরণ করিতে যত্নবান্ হয়। তিনি নব-বিবাহিতা পত্নী ও ১৬ মাসের একটি পুত্রকে আমাদিগের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, যতদিন তাহারা জীবিত থাকিবে, তাবৎ তাহারা আমার পরম আদরের ধন হইবে! ইহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী যথেষ্ট বিষয় বিভব তিনি রাখিয়া গিয়াছেন এবং

আমারও অনেকগুলি বাড়ী বিপুল সম্পত্তি আছে এবং তৎসমুদয় তাহাদিগের হইবে।

সমাজে সুরেশচন্দ্র অতি ধীর-প্রকৃতির লোক, আচার-ব্যবহারে অতি সভ্য, এবং সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। তাঁহার মস্তিষ্ক নূতন নূতন ভাবে পূর্ণ এবং সর্ব্বদাই বিজ্ঞানচর্চ্চায় রত। বিপদ্‌কালে তিনি নির্ভীক, এদিকে দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি এতই সুপণ্ডিত যে, এক সপ্তাহের মধ্যে আমার পরিবারের পক্ষাঘাতগ্রস্ত একটি পা কোন ডাক্তারেই আরোগ্য করিতে পারেন নাই, তাহা তিনি এককালে আরোগ্য করিয়াছেন। এই চিকিৎসা-প্রণালীকে তিনি দৈহিক তাড়িত কহেন। তিনি আমার পত্নীকে কোন ঔষধ সেবন করান নাই; তাহার শরীরে কেবলমাত্র স্বীয় হস্তের অঙ্গুলিচালনা-মাত্রেই তাহাকে আরোগ্য করেন।"

---

# প্রথম পরিশিষ্ট

লেফ্‌টেন্যাণ্ট সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—কলিকাতায় তাঁহার পিতৃব্যকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কতক হারাইয়া গিয়াছে; যেগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, নিম্নে তত্ত্বাবৎ অনুদিত হইল—

১

সেণ্টক্রুজ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭।

প্রিয় কাকা মহাশয়,—উপরে সেণ্টক্রুজ ঠিকানা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি আর এক্ষণে রাইয়ো-ডি-জেনিরোতে নাই। আমি তথা হইতে এখানে বদ্‌লি হইয়াছি। সেণ্টক্রুজ একখানি

ক্ষুদ্র গ্রাম, পূর্ব্বে অর্থাৎ কয়েক বৎসর পুর্ব্বে ইহা ব্রেজিলদেশীয় সম্রাটের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল ও তদীয় ক্রীতদাসগণ কর্ত্তৃক ইহার আবাদ হইত; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত স্বাভাবিক কারুণ্য বশতঃ তিনি সম্প্রতি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করায় এই স্থান নিতান্ত পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত এবং এক্ষণে কেবল গোচারণের মাঠমধ্যে গণ্য হইয়াছে। আমি এক্ষণে অশ্বারোহী সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত এবং এই সামরিক পদে অশ্বাদির ভার গ্রহণ করিয়াছি। এই সকল সামরিক অশ্ব ও অন্যান্য পশুচারণ জন্যই স্থানীয় বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। পিতৃব্য মহাশয়,—আমি আপনাকে অতি আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে, এক্ষণে আমি সৈনিক-শ্রেণীর উচ্চতর পদে উন্নিত হইয়াছি। আমি আর এক্ষণে সামান্য সৈন্য নহি,—আমি এক্ষণে যে পদে অধিষ্ঠিত, ফরাসী ভাষায় তাহাকে কেবো-ডি-এস্কোয়াড্রা এবং ইংরাজীতে কর্পোর্য়াল বলে, আমি এক্ষণে আমার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে স্বেচ্ছামত পরিচালন করিতে সক্ষম। আপনি আমাকে বারংবার লিখিয়াছেন যে, আমি যেখানে যাই বা যে জাতি দেখি, তৎসম্বন্ধে আপনাকে কিছু লিখি। কিন্তু তাহা হইলে আমাকে রাশি রাশি পুস্তক লিখিতে হয়। আমার অনেক ইয়ুরোপীয় বন্ধুও আমার জীবনী, আমার অভিজ্ঞতা, কার্য্যকলাপ প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে বলেন। বস্তুতঃই আমি অনেক দেশ, অনেক জাতি দেখিয়াছি। আমি প্রায় সমুদায় বিজ্ঞানই জানি; সাতটি ভাষাও জানি। ইংরাজী, ফরাসি, জার্ম্মান, স্পেনীয় এবং পর্টু গীজ এবং অল্প অল্প ইটালী, ডেনিস ও ওলন্দাজ ভাষায়ও কথা কহিতে পারি, তবে এই শেষোক্তগুলি আমি গণনামধ্যে ধরি না। আমি একটি কপর্দ্দকও বাটী হইতে লইয়া আসি নাই এবং বলিতে কি, আমি একবস্ত্রেই বাটী হইতে

বাহির হইয়াছিলাম। বরাবর আমার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে, মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিব এবং তাঁহার শিরোদেশ মণিমুক্তায় সুশোভিত করিব। যদি তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে অনেক দিন আগেই তাহা করিতাম—কারণ, এক্ষণে আমার সেরূপ অবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু পরম পিতার ইচ্ছা স্বতন্ত্র—সুতরাং এ জীবনে তাঁহার দর্শনলাভ আর ঘটিল না! হায়! আমি সংসারে একাকী এবং একাকীই থাকিব,—অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। অহো! সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অসীম রাজ্যে একাকী ভ্রমণ করা এবং প্রকৃতি-জননীর শোভা-সৌন্দর্য্য উপভোগই এক্ষণে আমার একমাত্র সুখ! প্রকৃত সখ্যতা, প্রকৃত প্রেম সংসারে দুর্লভ, এবং সেই জন্যই দার্শনিক পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, "পৃথিবীতে বাস করা আর অভিনব জগতের সৃষ্টি করা একই কথা"। আমি কল্পনাবলে দিব্য নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়াছি। একদিন আমি সেইখানে মদীয় স্নেহময়ী জননীকে দর্শন করিব! আপনারা সকলে হয় ত মনে করেন যে, আমি একজন নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে মাত্র! কিন্তু জানেন কাকা, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ভবঘুরের পদানত! অধিক কি, ভয়াকুল বন্য শ্বাপদ জন্তুগণও এই ভবঘুরের সম্মুখে মুগ্ধ শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কত শত আত্মীয়স্বজন-বিতাড়িত অর্থহীন ভিক্ষুক নির্লিপ্তভাবে এই ভবে বিচরণ করিতেছে, আপনার বিতাড়িত ও পরিত্যক্ত "সুরী"ও তাহারই একজন। কাকা! ভবঘুরে কথা আমি বড় ভালবাসি, এ শব্দটি আমার বড় ভাল লাগে; কারণ আপনি যাহাকে ভবঘুরে বলেন, প্রকৃতই আমি সেই! ভবঘুরে কাহাকে বলে? যাহার কোথাও থাকিবার স্থান নাই, এবং যাহার জন্য কেহই একবারও চিন্তা করে না, সেই ভবঘুরে। ফলে তাহারাই সমধিক জ্ঞানী, কেননা, তাহারা বন্ধনীহীন এবং নিত্য নূতন

তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত থাকে,—পৃথিবীতে যত সুখলাভ হইতে পারে, তাহারা তত্তাবৎলাভপ্রয়াসী, হয় ত বা তত্তাবতের অধিকারী। এই সকল ভবঘুরেদিগের বিশ্বাস যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরের এই বিশাল বিচিত্র বিশ্বের তাহারাই অন্যতম উত্তরাধিকারী, এবং এই বিশ্বাস,—এই ধ্রুব বিশ্বাসে নির্ভর করে, তাহারা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আনন্দে নৃত্যগীতাদি করিয়া দিনযাপন করে।

এতাবৎ কোন্ মনস্বী ব্যক্তি কবে এই মাধুর্য্যময় সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন? বীরগণের মধ্যে প্লেটোয়া-বিজেতা পসিমিয়স্ হইতে জার্ম্মান্ সম্রাট্ উইল্‌হেম অবধি, কবি ও দার্শনিকগণের মধ্যে জেরোয়াষ্টার, প্লেটো, হোরেস্ হইতে সেক্সপিয়ার, সিলার, পেটী, গোল্ডস্মিথ্ পর্য্যন্ত দেখুন, * * ইঁহাদের সকলেই মহাধীশক্তিসম্পন্ন ও সাতিশয় অভিমানী, বিশুদ্ধচেতা ও সুতীক্ষ্ণ কল্পনাশীল পুরুষ। * * * যাহা বলিতেছিলাম,—এই সকল ভবঘুরে ইহলৌকিক পিতৃসম্পত্তির লালসা রাখে না। অপর সকলে যাহা জানিতে ব্যস্ত, তজ্জন্য তাহারা উৎসুক নহে; স্ব স্ব মনোবৃত্তি অনুসারেই তাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত। উর্ব্বর কল্পনা-প্রভাবে তাহারা যেন শূন্যমার্গে উড্ডীয়ন প্রয়াসী; তাহাদিগের চিন্তা, কল্পনা, কার্য্য বিবিধ বিচিত্র রহস্য ভেদকল্পে, নবতত্ত্ব উদ্ভাবনায় নিয়ত নিযুক্ত। সাধারণ সামাজিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে অণুমাত্রও আসক্তি নাই। তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই উর্দ্ধতন রাজ্যে পরিধাবমান্;—হইবারই কথা, কারণ আত্মা যে ঈশ্বরের অংশ, দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন! * * * যাহা হউক, এ সকল উর্দ্ধতন প্রদেশের প্রসঙ্গ যাউক।—বাবা যে আমায় কলিকাতায় গিয়া তাঁহার ও আপনাদিগের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি একান্তই অক্ষম;—তৎপ্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণী নাই। আমি যাঁহাকে ভালবাসিতাম ও বাসি এবং যিনি আমাকে

ভালবাসিতেন ও এখনও বাসেন, তিনিত আর এ মর্ত্ত্যধামে নাই! আমি এক্ষণে ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহারই অপেক্ষায় এখানে রহিয়াছি, এবং থাকিব, যতদিন না তাঁহার সহিত গিয়া মিলিত হইতে পারি। সেই অনন্ত পথের যাত্রী,—চক্ষুর অগোচর মেঘমালার অভ্যন্তরে মণিময় মন্দির-দ্বারে তিনি যে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

২

রায়ো-ডি-জেনিরো ৫—১—৮৯।

কাকা মহাশয়, এই পত্র প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বোধ হয়, আমার আর একখানি পত্র পাইয়া থাকিবেন। আজি অতীব দুঃখিত অন্তরে ও বিরক্তির সহিত লিখিতেছি;—আমাদিগের হাঁসপাতালে পীতজ্বরে ঘন ঘন লোক মারা যাইতেছে। অগত্যা আমরা সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাড়ী লইয়াছি। একবার অনুধাবন করুন যে, এই ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে আমাদিগকে কি কষ্টকর কার্য্য করিতে হইতেছে! আজকাল এখানে তাপমান যন্ত্রের ৯৩ হইতে ৯৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম হইয়া থাকে, তা'ছাড়া বিদ্রোহ ত আছেই এবং তাহাতে আমাদিগের কতকগুলি সৈন্য গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়াছে। এই পত্র লিখিবার সময় আমিও তাহাদিগের কাতর ধ্বনি শুনিতেছি। কাকা মহাশয়, আমাদিগের পুরাতন হাঁসপাতালের সে ভীষণ দৃশ্য আপনি কল্পনায়ও আনিতে সক্ষম হইবেন না। পুরাতন হাঁসপাতাল নূতন স্থান হইতে অধিকদূর নহে। ইতিপূর্ব্বে জেসুট সম্প্রদায়ের যে পুরাতন মন্দির বা চার্চ্চ ছিল, তাহাতেই পুরাতন হাঁসপাতাল অবস্থিত। এখনও সেখানকার একটি ঘর আমার অধিকারে আছে, কারণ আমার সকল জিনিষপত্র এখনও সেখান হইতে আনিতে পারি নাই; তাহা ব্যতীত আমাকে সেখানে গিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে হয়; (বলা বাহুল্য আমি ডাক্তারী শিখিয়াছি)

এবং অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রাদিও সেখানে আছে। আর কিছু দিন যদি এখানে থাকি, তাহা হইলে আমি একজন ভাল অস্ত্র-চিকিৎসক হইতে পারিব। আমি প্রায় সকল প্রকার অস্ত্রোপচারে সক্ষম এবং ডাক্তারেরা তৎসমুদয় যথাযথ হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করেন। আমি যে হাঁস-পাতালের কথা বলিতেছিলাম, তাহা একটি খিলানবিশিষ্ট সুবৃহৎ গৃহ বা হল, উহার উপরে স্কাই-লাইট বা আলোক আসিবার পথ আছে। ঘরটি যখন শূন্য থাকে, তখন উহাকে সমাধি-মন্দির বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ লোকে সেই গৃহে প্রবেশ করিতে ভীত হয়; বস্তুতঃ সহজে কেহ তথায় প্রবেশ করেন না। আমাকে কার্য্যক্রমে বাধ্য হইয়া সেই-খান দিয়া সচরাচর যাতায়াত করিতে হয়; কিন্তু আমার তাহাতে কিছুমাত্র ভয় হয় না, কারণ, আমার বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মাগণ কখনই আমাদিগকে আশঙ্কিত বা বিরক্ত করিতে আসে না। প্রেতাত্মা সম্বন্ধে অনেক গল্পাদি শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎসমুদায় মানুষের নিজের কল্পনাপ্রসূত। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, প্রেতাত্মা আছে, কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, আর ভূতুড়ে বাড়ীতেও যথার্থই ভয় করে। কাকা মহাশয়, আমি মরণে কিছুমাত্র ভয় করি না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অনেক রোগীকে আমি চিকিৎসা করিয়াছি, অনেকে রোগ হইয়া মরিয়াও গিয়াছে। তথাপি আমি এখানে অবস্থান করিতেছি; আর যদি আমিও মরিয়া যাই, তাহা হইলে আরও ভাল। যদি ভগবান্ আমাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আবার এক দিন না এক দিন আপনাদিগকে যে দেখিতে পাইব, ইহাই আমার পরম আনন্দের বিষয়। যা'ক্, এই অপ্রীতিকর কথায় আর কাজ নাই।

কাকা, আমি শীঘ্রই এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব এবং এমন কোন একটা উপায় আবিষ্কার করিব যে, আমি অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতে পারিব; কারণ, ভ্রমণেই আমার অপার আনন্দ এবং তাহা হইতেই

একটা নূতন মৎলব পাওয়া যাইবে ও কোন দিন বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিব বলিয়া মনে হয়। আমি সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিব, কারণ, গতিই সৃষ্টির নিয়ম এবং জীবনের লক্ষণ। তা' ছাড়া ব্রেজিলে আসিয়া সামরিক বিভাগে পসার-প্রতিপত্তি লাভের যে বাসনা ছিল, তাহা আমার পূর্ণ হইয়াছে। আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল—ঘৃণার্হ রমণীজাতির সাধুতার বিষয় পরীক্ষা করা ; দ্বিতীয়, আমার জনৈক বন্ধু যে কোন এক সামরিক কর্ম্মচারীর দ্বারা অবমানিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লওয়া। এ দুই-ই আমার হইয়াছে, আমি রমণীজাতিকে ঘৃণার সহিত পরিবর্জ্জন করিয়াছি,—আর সেই বন্ধুবৈরী আমার আগমনের ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। অনেক কষ্টে এই সকল কার্য্য সমাধা হইয়াছে। আমি সুখজনক নাট্যময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ও কঠোরতাময় সৈনিক জীবন ইচ্ছাপূর্ব্বক তিন বৎসরের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই বৎসরের ১০ই মে তারিখে আমার একরার নামা—সৈনিক জীবন শেষ হইবে—তখন ইহাকে নমস্কার করিয়া নূতন কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া গিয়া এমন কোন উপায় অবলম্বন করিব, যদ্দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে ভদ্রলোকের ন্যায় থাকিতে পারিব। যদিও বাল্যকালে বাড়ীতে থাকিতে কোন কোন বিষয়ে আমি অতিশয় দুষ্ট ছিলাম, তথাপি, চিরদিন সরল ও সৎপথে থাকিয়া হৃদয় ও মনের উদারতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি! বিমানচারী বিহঙ্গদিগের ন্যায় পুনরায় যে আমি স্বাধীন হইয়া প্রফুল্লচিত্তে নানাদেশে পরিভ্রমণ করিব, ইহা স্মরণ করিয়াও আমার যে কি অপার আনন্দ হইতেছে, তাহা আর কি বলিব! আবিষ্কার বা অনুকরণ কার্য্যের জন্য আমি আবার বিজ্ঞানের চর্চ্চাই করিব। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি দুরন্ত পশুদিগের শিক্ষা দেওয়া বা শাসন করা—সে বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। আমি একটি বাক্যালাপী ছিন্ন মুণ্ড, বৈদ্যুতিক বালিকা,

ভৌতিক টেবিল এবং স্বচ্ছ বালিকা (যাহার শরীরের অভ্যন্তর দেখা যায়) সৃষ্টি করিব! এদেশে ও অন্যত্র এই চারিটি জিনিষ দ্বারা আমি অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিব। কাকা মহাশয়, যাহার অর্থোপার্জ্জন করিবার মস্তিষ্ক আছে এবং সরলহৃদয় আছে, তাহার পক্ষে এ জগতে অর্থ অতি সুলভ সামগ্রী। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার, এবং ঈশ্বর সকলের। পৃথিবীতে আমি আছি ও সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য আছে। ঈশ্বরের শক্তি মহান্ জানিয়া এবং পৃথিবী ঈশ্বরের বলিয়া যদি মনে করিয়া লই, তাহা হইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে সকল সৃজিত পদার্থই চলিতে থাকিবে।

সকল শাস্ত্র অপেক্ষা চিকিৎসা-শাস্ত্রই উচ্চ; আমি উহা খুব দক্ষতার সহিত শিখিয়াছি এবং উহার গুহ্যতম বিষয় পর্য্যন্ত জানিয়াছি। এই শাস্ত্রকে আমি পূজা করি, কিন্তু উহার পাণ্ডা বা অধ্যাপকদিগকে ঘৃণা করি, কারণ, তাহাদিগের হৃদয়ে উদারতার বড়ই অভাব! উদরতা-বিহীন চিকিৎসক, আর পক্ষহীন পরী একই পদার্থ। সকল শাস্ত্র অপেক্ষা মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ যে শাস্ত্র সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে এবং যদ্দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, তাহাই মহান্ ও উচ্চ। এ সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিব না, কারণ, উহা স্মরণেও আমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়! এ বিষয়ে আমি কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়াছি এবং তাহাতে কেবল আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে।

আপনার স্নেহাধীন—

সুরেশ।

৩

রোয়ো-ডি-জেনিরো,—১২ই মে, ১৮৯৩।

কাকা মহাশয়,—বস্তুতঃ অনেক দিন হইল, আপনার নিকট হইতে কোন পত্রাদি পাই নাই, গত বৎসর আপনাকে যে একখানি পত্র লিখি,

তাহাতে এখানে যে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে পত্রের কোন উত্তর পাই নাই। সামরিক বিভাগে আমার ভাল হইতেছে। প্রথম সার্জ্জেণ্ট পদ হইতে আমি ব্রিগেডীয়র পদে উন্নীত হইয়াছি! ইতঃপূর্ব্বেই আমি একজন চিহ্নিত-কর্ম্মচারী অর্থাৎ অফিসার হইতে পারিতাম, কিন্তু আমি বিদেশী বলিয়া তৎপক্ষে কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। ছয় বৎসর কাল আমি এখানে আছি এবং বিশেষ সুপরিচিত হইয়াছি ; সুতরাং আমার পক্ষে ইহা অনেকটা সুবিধার কথা বলিয়া বিশ্বাস করি। তার পর আপনারা সকলে বোধ হয় জানেন যে, এখানে সকলে পর্টুগীজ ভাষায় কথাবার্ত্তা কয় ; কাজেই আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন কাহারও কথা বুঝিতে পারিতাম না কিংবা কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিতাম না ; এক্ষণে সে ভাষা আমি শিখিয়াছি। যে পদে আমি অধিষ্ঠিত আছি, তাহা অতি অল্প লোকই পাইবার উপযোগী। সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট-কর্তৃক আমার পদোন্নতির কথা প্রচারিত হইলে আপনাকে যথাকালে জানাইব। বিগত ছয় বৎসর যে আমি সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছি, তাহা সরকারী কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ আছে, এবং বিনা কারাবাসে সামরিক যশোলাভ করিয়াছি। সম্প্রতি রায়ো গ্রাণ্ডি-ডি শিউলে যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি তথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তথায় আমাদিগের যাইবার কোন আদেশ এখনও প্রচারিত হয় নাই। পিতা মহাশয় আজকাল কেমন আছেন? তিনি কি আমাকে স্মরণ করেন? বাবাকে বলিবেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি ভালই আছি। আমি এক্ষণে মানুষ হইয়া উঠিয়াছি এবং সমাজে আমার মান-সম্ভ্রম হইয়াছে। বদমায়েসের কাছে আমি যম, ডাকাতের মধ্যে সেরা ডাকাত, ভদ্রলোকের নিকট ভদ্র, এবং পণ্ডিতের সমক্ষে পণ্ডিত। আমি আপনা হইতেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হইয়াছি, কেননা, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে

অদ্যাবধি কেহই আমার উন্নতি পক্ষে কোন চেষ্টা চরিত্র করেন নাই। আজ বোধ করি, আমার বত্রিশ কি চৌত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, বলিতে পারি না কত—যাহা হউক, আমি বিস্মিত হইয়াছি যে, ইহার মধ্যেই আমার মস্তকের কেশ এবং মুখের গোঁপ-দাড়ি পাকিয়া গিয়াছে, তা'ছাড়া মস্তকে টাকও পড়িয়াছে। সকলকে আমার কথা বলিবেন—আর আমাকে যাহারা জানে, তাহাদের খবরাখবর সমেত শীঘ্রই পত্র লিখিবেন।

আপনার স্নেহাধীন—

সুরেশ।

৪

রোয়ো-ডি-জেনিরো,—১০-১-৯৪।

কাকা মহাশয়,—আবার আপনাকে চিঠি লিখিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, কারণ, সেই অবধি আমি রিউমাটিসম্ ( বাত ) রোগে শয্যাগত হইয়া আছি। প্রায় একবৎসর হইল, আমি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। গত সপ্তাহে অধিক পরিমাণে মার্কারি ও আয়োডাইজ্‌ড্ অব্ পটাশ সেবন করিয়া বেদনা থামিয়াছে, কিন্তু উক্ত ঔষধ সেবনে বিষ-লক্ষণ দেখা যাওয়ায় উহা বন্ধ করিয়াছি। ডাক্তারেরা বলে যে, ইহা হইতে অব্যাহতি পাইতে অনেক সময় লাগিবে।

পত্রমধ্যে আমার দুইখানি ফটোগ্রাফ পাঠাইতেছি—একখানি আপনার ও অপরখানি বাবার জন্য! আমার কেমন একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, তিনি বোধ হয়, আর জীবিত নাই! আমি জানি না, আমার এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা! আমি যে ব্রেজীলদেশীয় পদাতি সৈন্যদলের অধিনায়ক বা লেফ্‌টেন্যাণ্টের পরিচ্ছদ পরিয়াছি, তাহা দেখিলে নিশ্চয়ই তিনি সুখী হইবেন এবং সে সুখ বা আনন্দ, গৌরব বা স্পর্দ্ধা—তাঁহারই। আপনি শুনিয়া হয় ত একেবারে স্তম্ভিত

হইবেন যে, এই পোষাকটি প্রস্তুত করাইতে আমার এক সহস্র ডলার খরচ হইয়াছে, কারণ, সুন্দর কাপড়, পালক, রেশম ও সোণার জরিতে ইহা তৈয়ারী হইয়াছে। আমার সহধর্ম্মিণীরও একখানি ফটোগ্রাফ পাঠাইলাম, উহা বিবাহের পূর্ব্বকার। এখনও আমার পুত্রের ফটোগ্রাফ তোলান হয় নাই, সুতরাং তাহা পাঠাইতে পারিলাম না। আমি যে অদৃশ্য হইয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। যুদ্ধ-সংঘটনের সায়ংকালে দশজন নৌ-সেনাকে কয়েদীরূপে ধরিয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া গেলাম, পরে আবার একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে একটি ভদ্রবেশী রমণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মৃত ব্যক্তিগণ কোথায় রক্ষিত বা স্থানান্তরিত হইয়াছে? আমি আগ্রহের সহিত গিয়া তাহাকে সেই স্থান দেখাইয়া দিলাম। সহসা দুই জন নৌ-সেনা ছোরা হস্তে আমাকে আক্রমণ করিল। আমিও তরবারী নিষ্কাশিত করিয়া আত্মরক্ষা করিলাম। আত্মরক্ষা ও প্রতি আক্রমণে তাহারা আমাকে যথেষ্ট সমর্থ ও সক্ষম দেখিয়া দ্রুতপদে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমিও তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রত্যাগমন মানসে ফিরিবার কালে স্থানীয় দুর্গন্ধে কষ্টবোধ হইল এবং বিশ পঞ্চাশ হাত যাইতে না যাইতে আমার মস্তক এমন ঘুরিয়া গেল যে, উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটস্থিত একখণ্ড প্রস্তরোপরি বসিয়া পড়িলাম এবং স্বতঃই নিজ অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলাম এবং পায়ে ঠাণ্ডা অনুভব করিলাম। সেই ঠাণ্ডা ক্রমে জানু ও উরু বহিয়া বুক পর্য্যন্ত উঠিল। অনন্তর ঠিক সেইরূপ শৈত্য কর্ণে অনুভূত হইয়া গণ্ডদেশ বাহিয়া বুকে আসিয়া থামিল। দুই জন অপরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিন দিবস পরে আমার জ্ঞান হইল। দুই জন অপরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অর্দ্ধ-উলঙ্গাবস্থায় আমি হাঁসপাতালে নীত হই। অষ্টাহ পরে কথা

কহিতে পারিলে স্বস্থানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম ও যথাস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। সকলে মনে করিয়াছিল যে, আমি হারাইয়া গিয়াছিলাম।

আপনার স্নেহাস্পদ—
সুরেশ।

৫

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় কাকা মহাশয়—আজ কয়েক দিন হইল, আমি আপনার পত্র পাইয়াছি এবং তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমি সামরিক জয়লাভ করায় দেশের লোক বড় সন্তুষ্ট হইয়াছে। এ সকল আমার কাছে এত সহজ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে আমি কিছু বিশেষত্ব বা আশ্চর্য্যজনক দেখিতে পাই না। তবে অন্যান্য অনেক অফিসার বিশেষ কার্য্য-কুশলতা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তাপের বিষয় এই যে, আর তাঁহাদিগকে ইহজগতে দেখিতে পাইব না। এক্ষণে আমার সামরিক শিক্ষার কথা বলি,—আমি প্রথম অশ্বারোহী দলে সৈনিকরূপে তিন বৎসর, পরে পদাতিক দলে পাঁচ বৎসর কার্য্য করি। বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যখন বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং আমাদিগের এই সুন্দর রায়ো-ডি-জেনিরো উপসাগরে তাবৎ রণপোত সম্মিলিত হইয়া "সান্তাক্রুজ", "ফেজ", "স", ও "জোয়াও" নামক সুন্দর সুন্দর দুর্গ সকল ঘেরিয়া ফেলিয়া তত্তাবতের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে থাকে, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদিগের কার্য্যকাল সমুপস্থিত। সেই সকল দুর্গ হইতে ভীমনাদে রণপোতগুলার প্রতি গোলা ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেশ ব্যাপিয়া চারিদিকে সৈন্য-সংগ্রহ হইতে লাগিল। উপসাগরকূলের তাবৎ উচ্চ-স্থানমাত্রই সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত হইল। যেখানে সেখানে ও সর্ব্বত্রই কাটাকাটি ও

প্রতিনিয়ত গোলাবর্ষণ চলিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বিদেশী লোক রায়ো-ডি-জেনিরো সহরে বাস করিতেছিল বলিয়া উহাকে বিধ্বংস করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী নৌসেনাগণ বিশখানি রণপোত সমেত নাথেরয় সহরটিকে আক্রমণ করিল। শত্রুপক্ষ শেষোক্ত নগর ভূমিসাৎ করতঃ, আমরা অতি অল্পসংখ্যক ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া, নগরে অবতরণ করিল। অতঃপর ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে যুদ্ধ হইল এবং তিন ঘণ্টাব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর নৌসেনাগণ পরাভূত হইয়া, কতক পলায়ন পূর্ব্বক স্ব স্ব জাহাজে গিয়া আশ্রয় লইল, অবশিষ্ট আমাদিগের হস্তে বন্দী হইল। পিতৃব্য মহাশয়, আপনি মনে করিবেন না যে, আমি যে পদে অধিষ্ঠিত, তাহা সহজে লাভ করিয়াছি। আমি যে কখনও বিশিষ্ট কর্ম্মচারী বা আফিসার হইতে পারিব, তাহা একবারও ভাবি নাই। প্রায় সর্ব্বদাই আমার পদোন্নতির কথা উঠিত; কিন্তু আমি বিদেশী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ খাতা হইতে আমার নাম কাটিয়া দিতেন। সম্প্রতি বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে আমি ও আমার অন্যান্য সহচর জনৈক জেনারেলের অধীনে কাজ পাই। উক্ত জেনারেল যদিও আমাকে চিনিতেন না, কিন্তু যুদ্ধকালে আমরা কিরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছি, তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তৎকালে আমার বীরত্ব ও শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ মধ্যে কিরূপ অসীম সাহসের সহিত প্রবেশ করি, তাহাও দেখিয়াছিলেন। অতঃপর আমি দেশী কি বিদেশী, তিনি তাহা জানিবার জন্য ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। আমার দক্ষতাই আমার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক বিবেচনা করিয়া তিনি সাধারণ-তন্ত্রের সামরিক সহকারী-প্রেসিডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিলে, আমি লেফ্‌টান্যাণ্টের পদে উন্নীত হই এবং এই পদে থাকিয়াই নাথেরয়ের অদৃষ্ট-মীমাংসার শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছি।

এই সঙ্গে আমি আপনাকে একখানি নাথেরয় যুদ্ধের ছবি পাঠাই-

তেছি। এইখানে আমার সহকারিগণ আমাকে বিশেষ ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিল, আমি কিন্তু কখনই তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করি নাই। আমাকে আপনারা সকলেই সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে বলেন, কিন্তু পিতৃব্য মহাশয়, যুদ্ধের ন্যায় ভয়াবহ কাণ্ডের কি বর্ণনা করা যায়? এমন যে মহামূল্য জীবন, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা আমরা হেলায় বিসর্জ্জন দিতে পারি। তবে যে যতটা পূর্ব্ব হইতে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, সে ততটা আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু বলুন দেখি, প্রকৃত সাহস কি? কোন অভীপ্সিত বস্তুলাভের জন্য অবিচলিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে জীবন উৎসর্গ করাকেই সাহস কহে। শত্রুগণ যখন দূরে অবস্থান করে, তখন বিবিধ বিচার, বিতর্ক, অপমান, পরিমাণ, যুক্তি, পরামর্শ প্রভৃতি সকলই সম্ভব; কিন্তু শত্রু নিকটস্থ হইয়া আক্রমণোদ্‌যোগী হইলে একমাত্র উপায়—সমগ্র সেনা একত্র করিয়া অগ্রসর হওয়া,—যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারিবে, সে শত্রুদিগকে তত অধিক পরিমাণে আতঙ্কিত করিতে পারিবে। আপনি আমার জীবনের আরও বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন। পৃথিবীর যে যে দেশে আমি গিয়াছি, সেইখান হইতেই ত আপনাকে পত্র লিখিয়াছি। আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, সার্কাসের সহিত সিংহ-পালক বা শাসক হইয়া সমগ্র ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশুদিগকে খেলা শিখাইয়াছি? এক সঙ্গে আমি এই পত্রের সহিত আপনার জন্য বেনস্ এরেস ( Buenos Ayres ) হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্র পাঠাইতেছি। উহাতে আমার জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

আপনার স্নেহের—

সুরেশ।

৬

রিও,—১২ই এপ্রেল, ১৮৯৭।

প্রিয় কাকা মহাশয়, আমি ১৫ই নবেম্বর তারিখে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া সাতিশয় দুঃখিত আছি। সেই পত্রসহ আপনাকে কতকগুলি সংবাদপত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলাম, সেগুলি পাইলেন কিনা, তাহাও জানিতে পারিলাম না। আমি শারীরিক অনেকটা ভাল আছি। আজ সাতিশয় আহ্লাদের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, আমার আত্মচরিত অনেকটা লেখা হইয়াছে, তবে সেটি সম্পূর্ণ করিতে অবশ্যই বিলম্ব হইবে। সম্প্রতি আমার কাজের এতই ভিড় পড়িয়াছে যে, উহা লিখিবার প্রায়ই সময় পাই না ; তবে আশা করি, সময়ে শেষ করিয়া তুলিতে পারিব। কাকা, জ্যোতিষ পড়িতে আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করি—এবং বহুদিবস হইতেই সাগ্রহে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার জন্ম-তারিখ যথাযথ লিখিয়া পাঠান। আমি স্বহস্তে নিজের একটি জাতচক্র প্রস্তুত করিবার মনস্থ করিয়াছি—তাহাতে আমার জন্মতিথি, নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহের যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিব। সেই চক্রখানি থাকিলে ভাবী বিপদ্, পীড়া প্রভৃতির কথা পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত হইয়া সেগুলি সহজেই প্রশমিত করিতে পারিব। আমি অন্যান্য অনেক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, এবং ঐ সকল শাস্ত্রের প্রকৃত তথ্যও জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু আমি মিলাইয়া দেখিতে চাই যে, জ্যোতিষ-ফলের সহিত সেগুলির ঐক্য হয় কিনা। সামুদ্রিক ও অন্যান্য লাক্ষণিক বিদ্যাবলে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ও চন্দ্র আমার সাতিশয় বলবান্। চন্দ্রের বলে আমাকে এত কাল্পনিক করিয়াছে এবং আমার জলযাত্রার হেতুভূত হইয়াছে। শুক্রের বলে আমি মনোমত কার্য্যসিদ্ধি

করিতে পারিতেছি—কল্পিত বিষয়গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী ক্ষমতা ও বিদ্যালাভ করিয়াছি। মঙ্গল আমাকে সৈনিকের সাহস ও হঠকারিতা প্রদান করিয়াছে এবং বৃহস্পতির প্রভাবে অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি ইহাও জানি যে, বুধ শনি, রবি প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহগণেরও অল্পাধিক আমার উপর দৃষ্টি আছে; তাহাদের ফলাফল জানিবার জন্য আমি সাতিশয় উৎসুক এবং তজ্জন্য তাহাদের স্থান-নির্ণয় আবশ্যক। কাকা, আপনি ত জানেনা যে, ইয়োরোপ-পর্য্যটনের সময় ইয়োরোপের সর্ব্বাগ্রগণ্য অধ্যাপকদিগের নিকট আমি এই সকল শাস্ত্রের শিক্ষালাভ করি; ভবিষ্যতে তাঁহাদের নাম, ধাম আপনাকে জানাইব। কিন্তু ভগবৎপ্রসাদে যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে সম্মোহন-তত্ত্ব, জ্যোতিষ ও অন্যান্য গুহ্যবিজ্ঞানগুলি আমি সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিব—সেই সকল বিষয়ে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিব। এই সকল বিদ্যাবলেই ত আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মনস্বিগণ সর্ব্বলোক-আরাধ্য নির্ব্বাণ লাভ করিতেন এবং অদ্যাপি সন্ন্যাসীরা নানাবিধ অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সাধিত করিয়া থাকেন;—ভূগর্ভে ইচ্ছামত বাস, মুহূর্ত্তমধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষোদ্গম ও তাহা হইতে ফলোৎপাদন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য ইহারই ফলে। জানি না, এই সকল বিষয়ে আপনার ধারণা কিরূপ,—এই সকল বিষয় জানিতে আপনার ঔৎসুক্য আছে কি না, প্রত্যুত এই সকল বিষয় জানিতে যদি আপনি আনন্দ অনুভব করেন জানিতে পারি, তাহা হইলে এতত্তাবৎ বিষয় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিব। যদি এই সকল আপনার বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের বংশের যুবকদিগকে যশঃ ও সম্মান-লাভের পথ প্রদর্শন করিব। অনুগ্রহপূর্ব্বক বাবা কেমন আছেন লিখিবেন। আমি জানি, তিনি সাতিশয় অসুস্থ—শারীরিক না হইলেও মানসিক ত বটেই; তাঁহার অবস্থা জানিতে পারিলে আমি তাঁহার কোন না কোন বিহিত

করিতে পারি। আমি জানি না, তিনি বাটীতে আছেন কি না; তজ্জন্যই আমি তাঁহাকে পত্র লিখি নাই।

কলিকাতার অনেকগুলি যুবক আমাকে পত্রযোগে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ব্রেজিলে আসিবার কোন উপায় আছে কি না; আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদিগের পত্রের উত্তর দিব।

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার যথোচিত অভিবাদন জানাইবেন।

আপনাদের স্নেহের—

স্থরেশ।

# দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

## শেষ পত্র

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ১৯০৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার বাল্যবন্ধু মিঃ পিঃ মুখার্জ্জিকে যে পত্র লিখেন, সেই পত্রে কর্ণেল বিশ্বাসের জীবনের বিবিধ অবস্থা ও বিবিধ ঘটনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই পত্রে তিনি বন্ধুর নিকট হৃদয় খুলিয়া, হৃদয়ের যে ছবি দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু বীরত্বের ছবি নহে, সহৃদয়তার ছবি। সেই ছবিতে আমরা তাঁহার স্বাভাবিক প্রেম-প্রবণতার পরিচয় প্রাপ্ত হই।

তিনি লিখিয়াছেন, "আমি মানসিক অশান্তি দূর করিবার নিমিত্ত ম্যাগনাটিজম্ ( আকর্ষণী বিদ্যা ), তড়িদ্বিদ্যা, জ্যোতিষ, গুপ্ত-তত্ত্ব, প্রেত-তত্ত্ব, শারীর-তত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যয়ন করি। কিন্তু ইহাতেও আমার অশান্তি দূর হইল না। ঘটনাক্রমে আমি দক্ষিণ আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সৈনিক জীবনের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের কথা জানা সত্ত্বেও আমি সাদরে ঐ পদ গ্রহণ করিলাম। তাহার পর ঐ বিভাগেই আমার পদোন্নতি হইল। ক্রমে আমি বিবাহ করিলাম। আমার তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিল। কঠোর জীবন-সংগ্রামে এইক্ষণ আমার মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, বার্দ্ধক্যের আক্রমণে আমার দেহের পেশী সকল এখনও শিথিল হইয়া যায় নাই। এখনও আমি সারাদিন অশ্বারোহণে কাটাইতে পারি, প্রয়োজন হইলে সেনাদলের সহিত অবলীলাক্রমে ১০ ক্রোশের পথ অগ্রসর হইতে পারি। এখনও আমার পূর্ব্বকার অশান্তি বিলুপ্ত হয় নাই।

একদিনের ইতিহাস বলিতেছি। সেই দিন রাত্রিতে আমি নগরের সেনানিবাস পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলাম। যাইতে যাইতে

একটি অট্টালিকা হইতে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত একটি চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অবিলম্বে অশ্বের বেগ সংযত করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম ও অট্টালিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। গৃহের চতুর্দ্দিকে দ্রব্য-সম্ভার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, রমণীরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা একটু স্থির হইলেন ও আমাকে জানাইলেন যে, গৃহস্বামীর কন্যা সাঙ্ঘাতিক রূপে পীড়িত। এইক্ষণ গৃহস্বামীও অনুপস্থিত। রোগিণী সারাদিনের মধ্যে একবারও পথ্যাদি মুখে তুলেন নাই, সারাদিন উদাস-দৃষ্টিতে জানালা-পথে শূন্যপানে চাহিয়া আছেন, সময় সময় এমন অধীর হইয়া পড়িতেছেন যে, তাঁহাকে কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই কথা শুনিয়া আমি একবার রোগিণীকে দেখিতে চাহিলাম। তাঁহারা সম্মত হইলে আমি রোগিণীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

রোগিণী অস্থিরভাবে মেজের উপর গড়াগড়ি দিতেছিল, আমাকে দেখিবামাত্র আমার মুখের উপর দৃষ্টি করিল, বলিল—"তুমি কি আমার সেই? আমি তোমারই আশায় রহিয়াছি।" তখন অপর রমণীদ্বয় আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আমাকে ইঁহারা চিনিতেন না। যাহা হউক, আমি কোনও দিকে মনোযোগ না করিয়া দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে রমণী দিকে অগ্রসর হইয়া আমার জান্তব তাড়িতশক্তির বলে আমি তাহাকে উঠিয়া বসিতে বলিলাম। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল। তাহার পর আমাকে বলিল, "যদি তোমার অনভিপ্রায় না হয়, আমি তোমার সঙ্গে যথা তথা যাইতে সম্মত আছি।"

আমি তাহার মস্তকে আমার দক্ষিণ হস্ত স্থাপনা করিয়া বলিলাম, "তোমার যেখানে খুসি, আমি সেইখানেই তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু তোমার স্নায়ু সকলের এইক্ষণ যেরূপ অবস্থা,

তাহাতে তোমার আধঘণ্টা কাল নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক।” ইহার পর দেখিতে দেখিতে বালিকা মেজের উপর অগাধ নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। তখন আমি উপস্থিত রমণীদ্বয়কে, ইহাকে একটি ভাল বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে বলিলাম ও আধঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে যেন জাগান না হয়, যেহেতু, আধঘণ্টা পরে আপনিই জাগিয়া উঠিবে। এই কথা বলিয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

তাহার পর আমি আর তথায় পদার্পণ করি না। কারণ, আমি, জানিতাম যে, আমাকে আর প্রয়োজন হইবে না! শুধু স্নায়ু সকলের উত্তেজনার জন্য এইরূপ হইয়াছিল, .সুতরাং আমার ম্যাগ্‌নেটিক শক্তির বলেই উহা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইবে।

এই ঘটনার দুই মাস পরে জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিয়া, বালিকার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি আমার বর্ত্তমান সুনাম ও খ্যাতির প্রতিপত্তির বিষয় অবগত আছেন, অধিকন্তু তিনি আমার জীবনের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দ্দশার বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন।

ইনিই সেই বালিকার পিতা, আমি তাঁহার কন্যার যে উপকার করিয়াছি, তদ্বিনিময়ে তিনি আমার জীবন-ব্যাধির একটি অব্যর্থ মহৌষধ দিতে ইচ্ছা করেন। যে লোকটিকে ইতঃপূর্ব্বে কখনও আমি দেখি নাই, সেই অপরিচিতের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি যার-পর-নাই বিস্মিত হইলাম। তার পর আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, সেই বালিকার নিকট হইতেই তিনি আমার জীবনের ইতিহাস জানিয়া থাকিবেন। বালিকা স্বপ্ন-সঞ্চারণের দ্বারা আমার অন্তঃকরণের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সকল দেখিয়া থাকিবে। যাহা হউক, তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহার প্রস্তাবে আগ্রহ জানাইলাম। তিনি গম্ভীর-মুখে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে প্রাচীনতম আর্য্যজাতির

কীর্ত্তিমান্ পুত্র, যে মহাপুরুষগণ আত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়া জানিতেন, সেই বীর্য্যবান্ আর্য্যগণের ছায়া আজ আমি তোমার বয়োরেখাঙ্কিত ললাটফলকে প্রতিফলিত দেখিতে পাইতেছি। ধন-সম্পদ্ এবং পদ-গৌরবের জন্য তুমি যে ভীষণ জীবন-সংগ্রাম করিয়াছ, আজ তাহাতে তুমি সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে না পারিলেও আংশিকরূপে জয়ের অধিকারী। পদগৌরব তুমি লাভ করিতে পারিয়াছ। তুমি যে অর্থসম্পদ্ সম্যক্ লাভ করিতে পার নাই, তাহারও কারণ আছে; তোমার কোমল হৃদয় অপরের দুঃখে যত কাঁদিয়াছে, আপনার জন্য তত কাঁদে নাই। দীনের দুঃখমোচন জন্যই তোমার ভাণ্ডার শূন্য। অপরে যে অনাহারে ও দুঃখ-কষ্টে দিন কাটাইতেছে, এই চিন্তা তোমার পক্ষে একান্ত অসহনীয়। অতীত জীবনের সেই সকল দুঃখ-দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া আজ তুমি দুঃখীর দুঃখ বিদূরিত করিতে আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছ।"

তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমার জীবনের দুর্দ্দৈবকে এই জন্য অভিনন্দন করিতেছি যে, তুমি তোমার পিতা-মাতা, ভাই ভগ্নী ও বন্ধু-বান্ধবকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য সর্ব্বদা নানা প্রকার জীবন-সংগ্রামে রত হইয়াছ।" এই কথা বলিয়া বক্তা একটি জার্ম্মাণদেশী কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, তুমি কি এই কয় ছত্র কবিতার মর্ম্ম অবগত আছ? কবি বলিতেছেন, "অজ্ঞানতাই জীবন এবং জ্ঞানই মৃত্যু। তুমি ক্রমাগত সেই মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইয়াছ এবং এখন তদ্রূপ করিতেছ, অথবা ঠিক উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছ। অপরের জন্য এইরূপ উদ্দাম ভালবাসা এবং চিন্তাকেই আমি উন্মত্ততা বা মৃত্যুর নামান্তর বলিয়া মনে করি। তোমার জীবন-নদী যখন অপরের দিকে সর্ব্বদাই প্রধাবিত, তখন আমি তোমাতে তোমার অস্তিত্ব পাইব কেমন করিয়া? এই সকল লোকদিগকে ভুলিয়া থাকাই এইক্ষণ

তোমার জীবনের পক্ষে একান্ত মঙ্গলকর।” এই কথা বলিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার কথাগুলি বুঝিতে পারিলে ত ?”

বলা বাহুল্য, আমি তাঁহার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু আমি যাহা এত চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারি নাই, যাহা আমার স্মৃতির সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা কেমন করিয়া আমার হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হইব ? হায়, হায়, সেই ভালবাসা আমি কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিব। প্রেমহীন-জীবন—প্রেমের স্মৃতিহীন জীবন—কেমন করিয়া থাকিতে পারে ? মৃত্যু পরেও যে প্রেমের অস্তিত্ব রহিয়াছে। একটী কথা বলিয়া আমি একটা জার্ম্মাণ কবিতা আবৃত্তি করিলাম।

তিনি আমার জার্ম্মাণ কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া আমাকে ধন্যবাদ করিলেন, তাহার পর বলিতে লাগিলেন, “তুমি ব্যতীত তোমার নিজের দুঃখের প্রতিকার করিতে আর কেহই সক্ষম হইবে না। তোমার অতীত কাহিনী তুমি বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর—যদি পার অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য মনকে একেবারে শূন্য করিয়া রাখিতে চেষ্টা কর। ইহা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার তাহাতে কিছু মনে সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু মানসিক শক্তির বলেই মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মবিজয়ী পুরুষেরাই প্রকৃত মহাপুরুষ বলিয়া গণনীয়। যখনই অবসর পাইবে, তখনই অন্যমন হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা কর, এই প্রকারেই মন নির্ব্বিষয় হইয়া যায়। ইহা ভারতীয় মুনিগণের এই প্রকারেই সর্ব্বকালের যোগী সম্প্রদায় আপনাদের মানসিক শক্তির বিকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তোমার ভারতীয় ঋষি ও গুরুগণ ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়াই মনসংযোগ অভ্যাস করিতেন এবং পরিণামে তাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিতেন।”

এই সকল কথা বলিয়া বৃদ্ধ থামিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ

দিলে তিনি তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য আমাকে একখানি কার্ড দিয়া বিদায় লইয়া উঠিলেন। এই কার্ডের উপর লেখা ছিল—মিঃ একলীমান্, ট্রাভেলার ও প্রফেসর, নিউ ইয়র্ক।

উপসংহারে সুরেশ বিশ্বাস তাঁহার বন্ধুকে লেখেন যে, আরও অনেক বিষয় বলিবার থাকিল তাহা তিনি পরে বলিবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইহার পর তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার বন্ধু আর কোন পত্র পান নাই।

—

# শেষ কথা

সুরেশচন্দ্রের সম্ভ্রম গৌরবের কথা কহিতে গেলে, আরও অনেক কথা কহিতে হয়। ঘটনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে কূলে গিয়া সুরেশচন্দ্র উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এখন পাশ্চাত্য জগতে ধন্য হইয়া আছেন। সুরেশচন্দ্রের পিতা মাতা উভয়েই এখন লোকান্তর। তাঁহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস এখনও জীবিত আছেন। তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বালিগঞ্জ কড়েয়ায় বসবাস করেন। সুরেশচন্দ্র তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পত্রাদি লিখিতেন। সেই সকল পত্রে তাঁহার মাতৃভক্তি ও উন্নতি খ্যাতির পরিচয় দেওয়া যায়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট তারিখে সুরেশ-চন্দ্রের মৃত্যু হয়; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ভারতবর্ষে ১৪ মাস পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে আসিয়া পৌছিয়াছে। মৃত্যু-কালে সুরেশচন্দ্রের বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জেষ্ঠ্যপুত্রের বয়স এখন প্রায় একুশ বৎসর হইবে। যাহা হউক সুরেশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রেজিলের বাঙ্গালীর স্মৃতির যে শেষ হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ কি !

সমাপ্ত

# পল্লীর প্রাণ

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ প্রণীত—২॥০

সময়োপযোগী বৃহৎ গার্হস্থ্য উপন্যাস

( দ্বিতীয় সংস্করণ )

বাঙ্গালার পল্লী-সংস্কার করিয়া পল্লীবাসের প্রতিষ্ঠার দিকে আজকাল দেশের লোকের অনুকূল দৃষ্টি পড়িয়াছে। মৃতকল্প বঙ্গ-পল্লী-শরীরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু পল্লীর সেই প্রাণ কোথায় আছে? কেমন করিয়া তাহার সন্ধান মিলিবে? গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বাঙ্গালার পল্লীর প্রাণের পরিচয় পাইবেন, প্রাণের সাড়া পাইবেন।

"পল্লীর প্রাণ" বাঙ্গালার পল্লী-সমাজের নিখুঁত চিত্র

---

# উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত—১।০

বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের অপরূপ রত্ন।—বাঙ্গালার সেই অদ্বিতীয় অমর গদ্য-কাব্য—সমস্ত মানবের মনোমুগ্ধকর। শ্মশান-বর্ণনার একটু নমুনা দেখুন:—"এইখানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, মহৎ, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরেজ, বাঙ্গালী এইখানে আসিলে সকলেই সমান।

---

# শশিনাথ

সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাস

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত—২॥০

প্রেমের চিত্রাঙ্কণে গ্রন্থকারের তুলিকা রাফেলকেও পরাজিত করিতে সমর্থ। লীলা-সরযূর ফোটে-ফোটে তবু ফোটে না প্রেম—উর্ম্মিলার সুস্পষ্ট ও সুব্যক্ত পতিপ্রেম,—বরেনের একনিষ্ঠ সংযত প্রেম;—শশিনাথের গঙ্গোর্ম্মিতুল্য উদ্দাম, অবাধ, হারাইয়া যাওয়া হঠাৎ ফিরিয়া পাওয়া অস্থিরগতি প্রেম—সুধীরের ঝড়ের বেগে আগন্তুক ও শরের বেগে পলাতক প্রেম—প্রকাশের 'বদ্‌লে গেল মত্‌টা' গোছের কপট প্রেম—প্রেমের বিবিধ ও বিচিত্র রঙ্গ ও লীলা এই একখানি গ্রন্থে সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা এমন মধুর, বর্ণনার ভঙ্গী এমন সুন্দর, কোন একটি প্রসঙ্গের অবতারণায় লেখনী এমন চতুর, বইখানির প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে তাহার পরিচয় সুপ্রচুর।

# নমিতা

( দ্বিতীয় সংস্করণ )

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত—২৲

ইহাতে মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ আছে, তাহা অতি সুন্দর। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা যে কেমন করিয়া জয়যুক্ত হয়, পরের অনিষ্ট করিতে গেলে যে, কেমন করিয়া নিজেরই অনিষ্ট হয়, সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 'নমিতা'র চরিত্রে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখিকা মহোদয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।

# ঘরের ডাক

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত—২৲

সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাস। ঘরের ডাক উপেক্ষা করিয়া আমাদের দেশেরই ছেলেমেয়েরা একটা বাহিরের আড়ম্বর লইয়া থাকিবে? সমাজ কি এখনও তাহাদের উপেক্ষার চক্ষে দেখিবে? দেশীয় খৃষ্টান-কন্যা সুশিক্ষিতা সুন্দরী লক্ষ্মী স্বদেশ স্ব-সমাজ হইতে দূরে লালিত-পালিত হইয়াও, পুরোপুরী খৃষ্টান হইতে পারে নাই। তাহার চিত্ত স্বাভাবিক আবেগে বাঙ্গালী সমাজের দিকে ছুটিয়া যাইত। সে আত্ম-সংযম করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, পারে নাই—অবশেষে 'ঘরের ডাকে' ঘরে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল।

---

**ঝড়ো-হাওয়া** শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। একখানি গার্হস্থ্য-সামাজিক ঔপন্যাস। সংসার-ক্ষেত্রে নিত্য ঝড় বহিতেছে, ঘটনার আবর্ত্তের মুখে পড়িয়া কত সংসার ছারখারে যাইতেছে, কত জীবনকুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে; কত এখানকার জিনিস ওখানে, সেখানকার জিনিস এখানে আনিয়া ওলটপালট করিয়া দিতেছে। এক বৈশাখী বৈকালী ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বইখানির আরম্ভ। মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ গ্রন্থকারের সুনিপুণ তুলির স্পর্শে যে রুদ্রমধুর ঝড়ের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহা দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন। মূল্য ২৲

…রুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স.
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা